ইসলামী ব্যাংক

ও

ইসলামী বীমা

সংকলন ও সম্পাদনা

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

Est. 1998
আল্লামা শাহ্ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন
ALLAMA SHAH ABDUL JABBAR FOUNDATION

আল্লামা শাহ্ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমা
মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার রিসার্চ একাডেমির পক্ষে
আবদুল আদী আল-হাসান, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম–৪১০০

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: জামাদিউল আউওয়াল ১৪৩০ হি. = মে ২০১০ খ্রি.
দ্বিতীয় প্রকাশ: রামাযান ১৪৩৬ হি. = জুলাই ২০১৫ খ্রি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ১২৪, বিষয় ক্রমিক: ০১

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন
নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার
ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তফাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

শব্দবিন্যাস: মু. সগির আহমদ চৌধুরী
ফোন: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬, মেইল: mujahid_sach@yahoo.com

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ: সাইলেক্স, সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম

মূল্য : ৮০ [আশি] টাকা মাত্র

***Islami Bank O Islami Bima*: By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Foundation, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 80 Tk**

e-mail:abdulhai.nadvi@yahoo.com
saajctg@yahoo.com
www.saajbd.org

ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

সুদভিত্তিক ব্যাংক-ব্যবস্থা বাংলা-ভারত উপমহাদেশে আসে ব্রিটিশ বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশবাদী শাসন ও ব্যবসার মাধ্যমে। সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশ লাভ করে পাকিস্তানের কাছ থেকে, আর পাকিস্তান লাভ করে ব্রিটিশ-ভারত থেকে। তবে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানে সুদ পরিহার ও ইসলামী ব্যাংকিং চালু করার প্রয়াস শুরু হয় এর জন্মলগ্ন থেকেই। ১৯৪৮ সালের ১ জুলাই পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাংকের গভর্নর জাহিদ হোসেন ঘোষণা করেন, ইসলামের মূলনীতি ও চাহিদা সম্পর্কে জ্ঞানী উপযুক্ত অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারদের দ্বারা পাকিস্তানের ব্যাংকিং রীতি-নীতিকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপায়ে সতর্কভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের চাহিদার সঙ্গে ব্যাংকিং রীতি-নীতিকে সমন্বয় করার বাস্তব পন্থা ও পদ্ধতি উদ্ভাবনই হবে তাদের মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের গবেষণা উইংকে সাজানো হয় এবং এ কাজের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ সময় ইসলামী উম্মাহর অপর অংশে বিশেষ করে মিসর ও মালয়েশিয়ায় ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে যায়। অনেক রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে এবং ইসলামী উম্মাহর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়।

বাংলাদেশের জনসমষ্টির প্রায় ৮৭ ভাগ ইসলামের অনুসারী। ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ সবারই জানা। তাই সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার সঙ্গে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর কখনও আত্মিক সংযোগ ঘটেনি। অথচ দেশের অর্থনৈতিক র্কমকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারলে জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন মহল থেকে তাই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার দাবি উঠেছে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই। এক্ষেত্রে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালের আগস্টে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশগুলোর অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলনে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক বা আইডিবি চার্টারে স্বাক্ষর করে। এই চার্টারে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে বাংলাদেশ আইডিবির ২২টি সদস্য দেশের অন্যতম দেশে পরিণত হয়। এ চার্টার অনুযায়ী বাংলাদেশসহ সব সদস্য রাষ্ট্র তাদের নিজ নিজ দেশে ইসলামী শরীয়া-ভিত্তিক অর্থনীতি ও ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে সম্মত হয়। পরে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও এ অঙ্গীকার পুণর্ব্যক্ত করা হয়। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা অনুমোদন করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক-ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাবও গৃহীত হয়।ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামী শরীয়ার আলোকে পর্যায়ক্রমে ঢেলে সাজানোর ব্যাপারে এ সম্মেলনে সুপারিশ করা হয়। বাংলাদেশ এ সম্মেলনে সক্রিয় অংশ নেয় এবং সুপারিশ অনুমোদন করে।

সংযুক্ত আরব-আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্টদূত মুহাম্মদ মুহসিন দুবাই ইসলামী ব্যাংকের (১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত) অনুরূপ বাংলাদেশে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে গণপ্রজাতন্ত্রীর বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র সচিবের কাছে লেখা এক চিঠিতে সুপারিশ করেন। এই চিঠির সঙ্গে দুবাই ইসলামী ব্যাংকের একটি সেমিনারের প্রতিবেদনও তিনি সংযুক্ত করে পাঠান। এর পরপরই ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ উইং বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিমত জানতে চায়।

১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদানীন্তন গবেষাণা পরিচালক এএসএম ফখরুল আহসান বিদ্যমান ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য দুবাই ইসলামী ব্যাংক, মিসরের ফয়সল ইসলামী ব্যাংক, নাসের সোস্যাল ব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামী ব্যাংকসের কায়রো অফিস পরিদর্শন করেন। ১৯৮১ সালের জানুয়ারিতে এই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, প্রতিটি রাষ্ট্রয়াত্ত

ব্যাংক জেলা পর্যায়ে সুদভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং চালু করবে।

১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন– ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো (IERB), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজম্যান্ট (BIBM), ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ইসলামিক ব্যাংকার্স অ্যাসোসিশেয়ন ও চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংকের ওপর এক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ফলে ১৯৮৩ মুসলিম বিজনেসম্যান সোসাইটির উদ্যোগে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিংয়ের ওপর বেশ কয়েকটি সেমিনার, প্রশিক্ষণ কোর্স ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮০ সালের মে মাসে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক সদস্য দেশগুলোর জন্য একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। তিনি সব ইসলামী দেশে এ আন্তর্জাতিক ব্যাংকের শাখা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ১৯৮০ সালের ১৫–১৭ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর নুরুল ইসলাম বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। ১৯৮১ সালের মার্চে সুদানের রাজধানী খার্তুমে অনুষ্ঠিত ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর গভর্নর সম্মেলনে পেশকৃত প্রতিবেদনে জানা যায়, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং চালু করার বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৮১ সালের ১৩ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের লেখা এক পত্রে পাকিস্তানের অনুরূপ বাংলাদেশে রাষ্ট্রয়াত্ত ব্যাংকগুলোর সব শাখায় পরীক্ষামূলকভাবে পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং কাউন্টার চালু করে এর জন্য পৃথক লেজার রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। ১৯৮১ সালের জুনয়ারি মাসে মক্কা এবং তাইফে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বাংলাদেশের মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সুপারিশ করেন, 'The Islamic countries should devellop a separate banking system of their own in order to facilitate their trade and commerce' অর্থাৎ মুসলিম দেশগুলোর উচিত তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার আলোকে একটি ব্যাংকিং-ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার করা।

ঐতিহাসিক মক্কা সম্মেলনে সুপারিশটি অনুমোদিত হয়। এজন্য বেসরকারি খাতে যৌথ উদ্যোগে ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং এর মাধ্যমে ইসলামী দেশগুলোতে বিনিয়োগকে ফলপ্রসূ করে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৬ এপ্রিল ১৯৮১চট্টগ্রাম হযরত শাহ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর উদ্যোগে দেশে সর্বপ্রথম বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সুদবিহীন ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ওপর দু'দিন ব্যাপী ফলপ্রসূ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনা নিরীক্ষণ মূল্যায়নের জন্য ঢাকায় আসেন এবং প্রস্তাবিত ইসলামী ব্যাংকে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) উদ্যোক্ত হিসেবে মূলধন বিনিয়োগের অনুকূলে সুপারিশ করে। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফলে ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ দেশ-বিদেশের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী সংস্থা বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের ধারণাকে বাস্তব রূপ দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এভাবে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত শরীয়া-ভিত্তিক ইসলামী উইন্ডোজ এবং কয়েকটি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামের বিনিয়োগ পদ্ধতি (Modes of Investment) অনুসরণ করে। অন্য কথায় এসব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান শরীয়া-অনুমোদিত হালাল পন্থায় বিনিয়োগ করে থাকে। বায় মুরাবাহা, বায় মুআজ্জাল, বায় সালাম, বায় ইসতিসনা, মুদারাবা, মুশারাকা, ইজারা বিল বায়, তাহতা শিরকাতুল মিলক ও করয ইত্যাদি বিনিয়োগ পদ্ধতি বাংলাদেশে বেশি অনুসৃত হচ্ছে। এসব বিনিয়োগ পদ্ধতির শরীয়া-সম্মত নীতিমালা পরিপালন করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা ও অন্যান্য ইসলামিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করছে।

বাংলাদেশের বৃহত্তম ইসলামী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বেসরকারি খ্যাতে দেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংক হিসেবে ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাংকটির অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা, বিস্ময়কর সাফল্য এবং জনগণের মধ্যে এ ধরনের ব্যাংকের সীমাহীন চাহিদার ফলে ১৯৮৭ সালের ২০ মে সউদি আরবে দাল্লাহ আল-বারা গ্রুপের সহযোগিতায় আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছি দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড। সম্প্রতি

ব্যাংকটির মালিকানা পরিবর্তন হয়েছে। একই সঙ্গে নামও পরিবর্তন হয়েছে। ব্যাংকটির নতুন নাম আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড।

১৯৯৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ও ২২ নভেম্বর সোস্যাল ইনভেনস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, ২০০১ সালের ১০ মে শাহ জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়ে শরীয়া-ভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। প্রচলিত দেশীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড (এক্সিম ব্যাংক) ২০০২ সালে এবং ২০০৩ সালে ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, যমুনা ব্যাংক লিমিটেড ও দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খোলার মাধ্যমে শরীয়া-ভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ২০০৪ সালের শেষের দিকে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা চালু করে আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড। সুদভিত্তিক ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করলেও ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেড ১ জানুয়ারি ২০০৯ সালে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নাম ধারণ করে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আলোকময় পবিত্র জগতে প্রবেশ করে।

ব্যাংক এশিয়া এ পর্যন্ত ৩টি ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো চালু করেছে। ২২ মে ২০১০ গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যাংক এশিয়া রাজধানীর মতিঝিলে প্রিন্সিপাল অফিস শাখায় শরীয়া-ভিত্তিক তৃতীয় ইসলামী ব্যাংকিং ইউন্ডো চালু করেছে। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড ২১ ডিসেম্বর ২০০৯ তোফখানা রোড শাখায় ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো উদ্বোধনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছে।

সম্প্রতি সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ৫টি গুরুত্বপূর্ণ শাখায় প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রমের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিং সেবা চালু করেছে। ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য বিশিষ্ট আলেম ও ব্যাংকারের সমন্বয়ে ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি শরীয়া কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রমের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিং সেবা চালু করেছে। বিদেশি ব্যাংকগুলোর মধ্যে বাহরাইন-ভিত্তিক শামিল ব্যাংক (সাবেক ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহারাইন ই. সি.) ১১ আগস্ট ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের ঢাকায় শাখা খোলার মাধ্যমে শরীয়া-ভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে ২০০৫ সালের ১৬ মে সংযুক্ত আরব-আমিরাতের ধাবি গ্রুপ ঢাকায় কর্মরত শামিল ব্যাংকটি কিনে নেয় এবং ১৬ মে ২০০৫ থেকে ব্যাংক আল-ফালাহ লিমিটেড নামে পাকিস্তান-ভিত্তিক ব্যাংকের বাংলাদেশি শাখা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। বর্তমানে বাংলাদেশে

এ ব্যাংকের মোট শাখা হচ্ছে ৫টি। এদেশে কার্যক্রমরত বিদেশি ব্যাংকগুলোর কয়েকটি সীমিত পরিসরে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছে। দি হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড (HSBC) বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০০৪ সালের ১৭ মার্চ 'আমানাহ ফাইন্যান্স' নামে বাংলাদেশে একটি শাখা খোলে। বিশ্বখ্যাত আরেকটি ব্যাংক স্ট্যান্ডার্ড চার্টাড ব্যাংকও ২০০৪ সালের শেষের দিকে গুলশান শাখায় একটি ইসলামী ব্যাংকিং সেবাকে 'সাদিক' নামে পরিচালনা করছে।

সম্প্রতি এ ব্যাংকটি সাদিক কার্ড নামে একটি ইসলামী ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে। অবশ্য এসব বিদেশি ব্যাংকের এই 'ইসলামী সেবা' শুধু রাজধানী ঢাকাকেন্দ্রিক। তবুও বলতে হবে, এসব কর্মকাণ্ডের ফলে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির সাফল্য ও জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হচ্ছে। এ হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি ব্যাংকগুলোর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বা শাখাধারী ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা মোট ২০টি। সংখ্যা হিসেবে তা দেশের ব্যাংকগুলোর প্রায় এক তৃতীয়াংশেরর বেশি এবং সবকটি ব্যাংকই সেন্ট্রাল শরীয়া বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশের সদস্যভুক্ত। এসব ব্যাংক ইসলামী বিনিয়োগ ব্যবস্থা অনুসরণ করে থাকে। বাংলাদেশ এবং বিশ্বে ইসলামী বিনিয়োগ ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে এসব ব্যাংক যথেষ্ট অবদান রাখছে।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী দুটি সরকারি ব্যাংক রূপালী ব্যাংক লিমিটেড ও জনতা ব্যাংক লিমিটেড এবং বেসরকারি খাতের ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড ও ব্র্যাক ব্যাংক এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এদেশে সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

সূত্র: মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, আমার দেশ

ইসলামী ব্যাংক

প্রশ্ন: ইসলামী ব্যাংক কী?

উত্তর: ইসলামী ব্যাংক ইসলামী নীতিমালার আলোকে ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ওআইসির সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ইসলামী ব্যাংক এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা এর মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি সকল পর্যায়ে ইসলামী শরীয়ার নীতিমালা মেনে চলতে বদ্ধপরিকর এবং কর্মকাণ্ডের সকল স্তরে সুদ বর্জন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।'

অন্য এক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংক এমন এক কোম্পানি যা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত; ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসা এমন ধরনের ব্যবসা যার লক্ষ্য ও কার্যক্রমের কোথাও এমন কোন উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করেনি।

প্রশ্ন: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কখন প্রতিষ্ঠিত হয়? এর প্রথম শাখা কখন আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম চালু করে?

উত্তর: প্রতিষ্ঠাকাল: ১৩ মার্চ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ। প্রথম শাখা উদ্বোধন: ৩০ মার্চ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ। লোকাল অফিস: মতিঝিল ঢাকা (তৎকালীন প্রধান শাখা, ঢাকা), আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন: ১২ আগস্ট ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ।

প্রশ্ন: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের উদ্যোক্তা কারা ছিলেন?

উত্তর: স্বদেশি উদ্যোক্তা:

১. মরহুম মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক লস্কর,
২. মরহুম মুফিজুর রহমান,
৩. ব্যারিস্টার তমিজুর রহমান,
৪. মরহুম মুহাম্মদ ইউনুস,
৫. মরহুম মুহাম্মদ সফিউদ্দীন দেওয়ান,

৬. মুহাম্মদ বশীর উদ্দীন,
৭. মরহুম মুহাম্মদ হোসেন,
৮. মরহুম নাসিরুদ্দীন আহমদ,
৯. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন,
১০. মরহুম মুহাম্মদ মালেক মিনার,
১১. জাকির উদ্দীন আহমদ,
১২. এম. এ. রশীদ চৌধুরী,
১৩. ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল আনোয়ার,
১৪. অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ,
১৫. সিরাজুদ্দৌলা,
১৬. শাহ আবদুল হান্নান (প্রতিনিধি, ইবনে সিনা ট্রাস্ট),
১৭. একেএম নাজির আহমদ (প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার),
১৮. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন (প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো),
১৯. মরহুম মুহাম্মদ নুরুজ্জামান,
২০. আবুল কাসেম,
২১. এ. কে. ফজলুল হক,
২২. ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ দাউদ খান,
২৩. মাওলানা শাহ আবদুল জাব্বার (রহ.) (প্রতিনিধি, বায়তুশ শরফ ফাউন্ডেশন লিমিটেড, চট্টগ্রাম) ।

বিদেশি উদ্যোক্তাঃ

১. ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, সৌদি আরব,
২. কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস (কেএসসি,) কুয়েত,
৩. জর্দান ইসলামিক ব্যাংক, জর্দান,
৪. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এক্সেচেঞ্জ কর্পোরেশন, দোহা, কাতার,
৫. বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক, বাহরাইন,
৬. ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিং এসএ, লুক্সেমবার্গ,
৭. আল-রাজী কোম্পানি ফর কারেন্সি এক্সেচেঞ্জ অ্যান্ড কমার্স, সৌদি আরব,
৮. শায়খ আহমদ সালাহ জামজুম, সৌদি আরব,
৯. মরহুম শায়খ ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল-খতীব, সৌদি আরব,

১০. দুবাই ইসলামিক ব্যাংক, দুবাই সংযুক্ত আরব-আমিরাত,
১১. পাবলিক ইনস্টিটিউশন ফর সোস্যাল সিকিউরিটি, কুয়েত,
১২. মিনিস্ট্রি অব আওকাফ অ্যান্ড ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স, কুয়েত,
১৩. মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস, ডিপার্টমেন্ট অব মাইনর অ্যাফেয়ার্স, কুয়েত।

প্রশ্ন: ইসলামী ব্যাংকের প্রথম চেয়ারম্যান কে ছিলেন?
উত্তর: জনাব মরহুম আবদুর রাজ্জাক লস্কর।

প্রশ্ন: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের শরীয়া কাউন্সিলের প্রথম চেয়ারম্যান কে ছিলেন?
উত্তর: বায়তুশ শরফের মরহুম পীর হযরত শাহ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার (রহ.)।

প্রশ্ন: আমানত গ্রহণের উদ্দেশ্য ইসলামী ব্যাংকে কি কি হিসাব কাজ করে?
উত্তর: বিভিন্ন হিসাব বা একাউন্টের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক আমানত গ্রহণ করে। আমানত গ্রহণের উদ্দেশ্যে হিসাবগুলোকে প্রধানত দুই ভাগ করা যায়:

১. আল-ওয়াদিয়াহ হিসাব,
২. মুদারাবা হিসাব।

আল-ওয়াদিয়াহ হিসাব

ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়ার আল-ওয়াদিয়াহ নীতির ভিত্তিতে আল-ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাব (কারেন্ট একাউন্ট) পরিচালনা করে। এই হিসাব জমাকৃত অর্থ ব্যাংক গ্রাহককে চাহিবামাত্র ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকার করে। অন্যদিকে ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে এই অনুমতি নেয় যে, ব্যাংক তাঁর টাকা ব্যবহার করতে পারবে। এই হিসাবে গ্রাহক তাঁর ইচ্ছা-মাফিক লেনদেন করতে পারেন। এই হিসাবে কোন লাভ দেওয়া হয় না কিংবা জমাকারীকে কোন লোকসানও বহন করতে হয় না।

মুদারাবা হিসাব

ইসলামী শরীয়আহর মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকের নিম্নলিখিত হিসাবগুলো পরিচালিত হয়:

১. মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব,
২. মুদারাবা মেয়াদী হিসাব,
৩. মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয়ী হিসাব,
৪. মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড,
৫. মুদারাবা বিশেষ (পেনশন) হিসাব,

৬. মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা (এমএফসিডি) (সঞ্চয়) হিসাব,
৭. মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় হিসাব,
৮. মুদারাবা স্বল্পমেয়াদী হিসাব (এমএসএনএ) ও
৯. মুদারাবা ওয়াকফ ক্যাশ ডিপোজিট একাউন্ট ।

এসব হিসাবে ব্যাংক 'মুদারিব' এবং গ্রাহক 'সাহিব আল-মাল' হিসেবে গণ্য হন। ব্যাংক জমাকারীর পক্ষে তাঁর জমাকৃত অর্থ বিনিয়োগ করে এবং মুদারাবা তহবীল বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয়ের কমপক্ষে শতকরা ৬৫ ভাগ মুদারাবা হিসাবসমূহে বছর শেষে বণ্টন করে।

প্রশ্ন: ব্যাংক ডিপোজিটরদের লাভ ও শেয়ারহোল্ডারদের ডিভিডিন্টের হার কম-বেশি হয় কেন এবং এটা শরীয়া-সম্মত কি?

উত্তর: ব্যাংকের ডিপোজিটগণ (আসহাবুল মাল) মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে ব্যাংকে অর্থ জমা রাখেন। সে হিসেবে ডিপোজিটরদের অর্থ বিনিয়োগ করে যে আয় হয় ডিপোজিটরগণ চুক্তি মোতাবেক কেবল সে আয়ের অংশ লাভ হিসেবে পেয়ে থাকেন। অপরপক্ষ ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারগণ বিনিয়োগ আয় থেকে প্রাপ্ত লাভ ছাড়াও ব্যাংকের অন্যান্য অর্থ বিনিয়োগলব্ধ আয়, কমিশন এবং সহায়ক আয় (Ancillary Income) ইত্যাদিসহ যাবতীয় আয়ের অংশ ডিভিডেন্ড হিসেবে পেয়ে থাকেন। সুতরাং ডিপোজিটর ও শেয়ারহোল্ডারগণের লাভ ও ডিভিডেন্ডের হারে তারতম্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক ও শরীয়া-সম্মত।

প্রশ্ন: ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিনিয়োগ করা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী অনুমোদিত কি?

উত্তর: সুদের সাথে জড়িত কোন সংস্থার শেয়ার সিকিউরিটিতে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতিগতভাবে ইসলামী শরীয়া অনুমোদন করে না। তবে নিম্নলিখিত পদ্ধতি ও শর্ত-সাপেক্ষে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠান দু'ভাবে সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে:

ক. কারবারটাই মূলত সুদী।
খ. সুদী ব্যাংক/সুদী আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিয়ে হালাল ব্যবসা পরিচালনা করে।

প্রথম ক্ষেত্রে যেহেতু প্রতিষ্ঠানের মূল কারবারটাই সুদ-ভিত্তিক, সেহেতু এরূপ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিনিয়োগ করা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সংশয় নেই। কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে বিনিয়োগ করা নিম্নলিখিত শর্ত-সাপেক্ষে বৈধ হতে পারে বলে শরীয়া বিশেষজ্ঞগণের ফতোয়া রয়েছে:

ক. যদি তারা তাদের শেয়ারে মূলধন শরীয়া-সম্মত পন্থায় বিনিয়োগ করে,

খ. যদি তারা হালাল বিনিয়োগ হতে উপার্জিত আয় থেকেই ডিভিটেন্ড প্রদান করার অঙ্গীকার করে,

গ. যদি তারা তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ সুদের ভিত্তিতে কোন ব্যাংকে জমা না রেখে লাভের ভিত্তিতে কোন ইসলামী ব্যাংকে জমা রাখে।

প্রশ্নঃ শরীয়া অনুযায়ী প্রাপ্য লাভের (Profit Receivable) হিসাব পদ্ধতি কি হওয়া বাঞ্ছনীয়?

উত্তরঃ আদায়কৃত লাভই সংশ্লিষ্ট বছরের হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয় এবং প্রকৃত লাভ বণ্টন করাই শরীয়তসম্মত। তবে ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রাপ্য লাভের (Profit Receivable) আদায় নিশ্চিত হলে তা আমানতদারদের মধ্যে বণ্টন করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ ব্যাংকের বার্ষিক হিসাব চূড়ান্ত করার পূর্বে কোন জমাকারী হিসাব বন্ধ করার ইচ্ছা করলে তার হিসাবের লভ্যাংশ প্রদানের শরীয়া-সম্মত পন্থা কী?

উত্তরঃ ব্যাংকের লাভ-লোকসান হিসাব চূড়ান্ত করার পূর্বে অন্তর্ববর্তীকালীন আনুমানিক লাভ সকল মুদারাবা জমাকারীর হিসাব (Account) এই শর্তে প্রদান করা যেতে পারে যে, ব্যাংকের লাভ-লোকাসন হিসাব চূড়ান্ত করার পর যদি প্রকৃত লাভ পূর্বের প্রদত্ত আনুমানিক লাভের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে লাভের বাকী অংশ জমাকারীদের হিসাবে যথানিয়মে প্রদান করতে হবে, আর যদি প্রকৃত লাভ পূর্বেপ্রদত্ত লাভের চেয়ে কম হয় তাহলে মুদারাবা জমাকারীদের হিসাবে (Account) প্রদত্ত অতিরিক্ত অংশটুকু ব্যাংক কেটে নেবে বা জমাকারী (Account-holder) তা ফেরৎ দেবে।

চূড়ান্ত লাভের হার ঘোষণা হওয়ার পূর্বে কোন মুদারাবা সঞ্চয়ী/মেয়াদী আমানত হিসাব বন্ধ করার সময় কিংবা কোন মেয়াদী আমানতপূর্তির পূর্বে বা পরে নগদায়নকালে সাময়িক হার ধরে তদনুযায়ী লাভ প্রদান করে উক্ত হিসাব বন্ধ কিংবা নগদায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, তবে পরবর্তীতে হিসাব চূড়ান্ত হলে প্রাপ্য লাভ জমাকারীদেরকে প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশ্নঃ ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বর্তমান থাকা অবস্থায় ইসলামী ব্যাংকের জন্য প্রচলিত ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির পলিসি গ্রহণ করা সমীচীন হবে কি?

উত্তরঃ শরীয়া অনুমোদিত পদ্ধতিতে সকল প্রকার পলিসি কভারেজ দিতে সক্ষম ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বর্তমান থাকা অবস্থায় ইসলামী ব্যাংকের জন্য প্রচলিত ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির পলিসি গ্রহণ করা বৈধ নয়।

প্রশ্নঃ বীমা পলিসি গ্রহণের বিপরীতে ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে ব্যাংকের সন্দেহজনক আয় হতে প্রিমিয়াম প্রদান করা কি শরীয়া-সম্মত?

উত্তরঃ যেহেতু ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তাদের কার্যক্রম ইসলামী শরীয়া অনুমোদিত পদ্ধতিতে পরিচালনা করে থাকে। সেহেতু ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে ব্যাংকের বৈধ আয় হতে প্রিমিয়াম প্রদান করা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন যাকাত বাবদ প্রাপ্ত অর্থ থেকে করয/ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগ করতে পারবে কি?

উত্তরঃ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের গ্যারান্টি দেওয়ার শর্তে যাকাতের অর্থ শুধু যাকাতের হকদারকেই করয/ঋণ ও বিনিয়োগসুবিধা প্রদান করা যাবে। তবে এক বছরের বেশি সময়ের জন্য যাকাতের অর্থ করদ/ঋণ প্রদানর বা বিনিয়োগ না করা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নঃ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেমনে প্রদত্ত যাকাত-সাদাকার অর্থ ব্যয়ের খাতগুলো কি কি?

উত্তরঃ যাকাত একটি ফরয ইবাদত। আল-কুরআনে যাকাতকে সাদাকা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। আল-কুরআনে যাকাত/সাদাকা ব্যয়ের ৮টি খাত সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। খাতগুলো হচ্ছে,

১. ফকীর,
২. মিসকীন,
৩. যাকাত আদায় কার্যে নিয়োজিত কর্মচারী,
৪. আল-মুআলাফাতুল কুলুব (যাদের মন জয় করা প্রয়োজন),
৫. দাস মুক্তকরণ,
৬. ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি,
৭. আল্লাহর পথে জিহাদ ও
৮. মুসাফির।

ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশনপ্রাপ্ত যাকাত ও সাদাকার অর্থ উপরোক্ত খাতসমূহে ব্যয় করতে পারে।

প্রশ্নঃ ওভার ড্রাফট ও ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করে ইসলামী ব্যাংক সার্ভিজ চার্জ ও কমিশন আদায় করতে পারবে কি?

উত্তরঃ কোন জমাকারীকে তার জমাকৃত অর্থ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করাকে ওভার ড্রাফট বলা হয়। এটি আসলে ঋণ। সুতরাং এর বিপরীতে কোন লাভ/কমিশন আদায় করা যাবে না। তবে সার্ভিস চার্জ হিসেবে প্রকৃত খরচ উসূল করা যেতে পারে।

মেয়াদী আমানতের বিপরীতে ইসলামী ব্যাংক জমাকারীকে করয প্রদান করে। উক্ত করযের/ঋণের ওপর অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা যাবে না। তবে সার্ভিস চার্জ হিসেবে করয/ঋণ প্রদান ও আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক প্রকৃত খরচ আদায় করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ গ্রাহককে কি কি পদ্ধতিতে চলতি মূলধন (Working Capital) হিসাবে নগদ অর্থ সরবরাহ করা যাবে?

উত্তর: ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ গ্রাহককে প্রধানত মুশারাকা, মুদারাবা, ইসতিসনা ও বায় সালাম পদ্ধতিতে চলতি মূলধন হিসেবে নগদে অর্থ প্রদান করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: ভিসিআর, ভিসিপি ও ডিশ এন্টেনা ইত্যাদিতে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ করতে পারবে কি?

উত্তর: ভিসিআর, ভিসিপি ও ডিশ এন্টেনা ইত্যাদি জিনিস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভালো কাজের চেয়ে মন্দ কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমাদের সমাজে এগুলো ব্যবহারের ভালো দিক বলতে গেলে একেবারে নগণ্য। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের জন্য এসব আইটেমে বিনিয়োগ করা সমীচীন নয়। তবে মন্দ দিকগুলো হতে মুক্ত থাকার নিশ্চয়তা থাকলে অঙ্গিকারাবদ্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন: গ্রান্ট, লোন, এইড, বার্টার ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিভাবে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান ও এলসি খোলা যাবে?

উত্তর: বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোই ডেজিগনেটেড ব্যাংকরূপে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। অতএব লোন, এইড, ক্রেডিট, বার্টার এবং গ্রান্টের অধীনে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য এগুলোর সাথে ইসলামী ব্যাংক একটি চলতি হিসাব সংরক্ষণ করতে পারে। এই হিসাবের ওপর কোন সুদ দেওয়া/নেওয়া হবে না—এই মর্মে ইসলামী ব্যাংক ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের উচ্চ স্তরের কর্তৃপক্ষ পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে চুক্তি সম্পদিত হতে পারে। উপরোক্ত ক্ষেত্রে সুদ পরিহার করতে হবে। তবে মালামালের মূল্য হিসেবে আমদানী বিল পরিশোধ করলে তা শরীয়া-পরিপন্থী হবে না।

প্রশ্ন: সরকার/সরকারী সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড/সিকিউরিটি জাতীয় ইন্সট্রুমেন্টকে বিনিয়োগের বিপরীতে কোলেটার‍্যাল সিকিউরিটি (রেহেন/বন্ধক/জামানত) হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয কি?

উত্তর: বিনিয়োগের বিপরীতে কোলেটার‍্যাল সিকিউরিটি/অতিরিক্ত জামানতরূপে উলিখিত বন্ড/সিকিউরিটি জাতীয় ইন্সট্রুমেন্টসমূহ কতিপয় শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করা শরীয়ার দৃষ্টিতে অবৈধ নয়। শর্তগুলো নিম্নরূপ:

ক. উল্লিখিত বন্ড/সিকিউরিটিসমূহের ফেস ভ্যালু বা অবহিত মূল্যই কেবল প্রস্তাবিত জামানতরূপে বিবেচিত হবে।

খ. বন্ড/সিকিউরিটিসমূহের বিপরীতে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে প্রাপ্ত অর্থ সুদরূপে গণ্য হবে এবং ইসলামী ব্যাংক তা গ্রহণ করতে পারবে না। তবে ব্যাংকের পাওনার সমপরিমাণ অংশ সংশ্লিষ্ট ঋণ সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে নেওয়া যেতে পারে।

গ. ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উক্ত বন্ড/সিকিউরিটিসমূহ প্রয়োজনে বিক্রি করতে বাধ্য হলে কেবল ফেস ভ্যালুই গ্রহণ করতে পারবে।

ঘ. বন্ড সিকিউরিটিসমূহের বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি ব্যাংকের প্রাপ্ত অর্থের অতিরিক্ত হয়, তবে অতিরিক্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট জামানতদারকে ফেরত দিতে হবে।

প্রশ্ন: ইসলামী ব্যাংক বা ইসলামী প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের নিয়োগ জায়েয কি?

উত্তর: ইসলামী পরিবেশ ও শরয়ী হিজাবের ব্যবস্থা থাকলে ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী প্রতিষ্ঠান এমনকি প্রচলিত যে কোন প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের নিয়োগ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: ইসলামী ব্যাংকের মুনাফা ও অন্যান্য ব্যাংকের সুদ কি একই না শুধু নামের তফাৎ?

উত্তর: ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে কিছু লোককে প্রায়ই বলতে শোনা যায়, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংক আসলে একই কাজ করে, ইসলামী ব্যাংক একটু ঘুরিয়ে খায়। সুদ বলুন আর মুনাফা বলুন, আসলে দুটি একই। ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য তো দেখা যায় না। যেমন প্রচলিত ব্যাংকে টাকা রাখলে নির্ধারিত হারে সুদ পাওয়া যায়। ইসলামী ব্যাংকে টাকা রাখলে প্রায় একই নিয়মে মুনাফা পাওয়া যায়। ব্যাংক থেকে টাকা ঋণ নিতে গেলে নিয়ম-কানুন, হিসাবপত্র, লেনদেন সবকিছু উভয় ব্যাংকে একই রকম মনে হয়। তা হলে ইসলামী ব্যাংক তো প্রচলিত ব্যাংকের মতই। পার্থক্যটা কোথায়?

এমনকি যারা সুদের গুরুতর পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইসলামী ব্যাংক-কে আশার আলো মনে করেন, এ কথাগুলো তাদের মনেও এক ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। এভাবে ইসলামী ব্যাংকের সাথে প্রচলিত ব্যাংকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখে অনেকে ইসলামী ব্যাংক আসলে সুদমুক্তভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি-না এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে।

এসব সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আসল কারণ হলো, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, দুটিই ব্যাংক। তাই উভয়ের কাজকর্ম বাহ্যিকভাবে একই রকম মনে হতে পারে। কিন্তু বাহ্যিকভাবে কিছু দেখে দুটিকে অভ্যন্তরীণভাবে একই বলা অন্যায়। কারণ, আমাদের সামনে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেখানে দুটি বিষয়কে দৃশ্যত এক রকম মনে হয়; কিন্তু মৌলিকভাবে ও পদ্ধতিগতভাবে দুটিকে কিছুতেই এক বলা যায় না। কাজের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া আলাদা হওয়ার কারণে দুটির মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে এ পার্থক্যটা অনেক সময় বোঝা যায় না। তবে একটু চিন্তা করলেই দুটির মধ্যকার যে অর্থবৎ ব্যবধান তা পরিস্কার হয়ে যায়।

প্রশ্ন: সুদ ও মুনাফার পার্থক্য কি?

উত্তর:

১. মুনাফা ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ অর্জিত হয়, আর সুদ অর্জিত হয় ঋণ ও সময়ের ওপর ধার্যকৃত হস্তান্তরিত আয়ের মাধ্যমে।

২. মুনাফা হচ্ছে উদ্যোক্তার পুঁজি, শ্রম ও সময় বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি গ্রহণের ফল, আর সুদের ক্ষেত্রে ঋণদাতা পুঁজি, শ্রম ও সময় বিনিয়োগ এবং ঝুকি গ্রহণ করে না, অর্থ ধার দেয়।

৩. মুনাফা অনির্ধারিত ও অনিশ্চিত। এতে ঋণদাতার আয় নিশ্চিত; কিন্তু ঋণগ্রহীতার লাভের কোন নিশ্চয়তা নেই।

৪. মুনাফায় ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়, আর সুদে ঝুঁকি নেই।

৫. ব্যবসায় কোন পণ্যের ওপর লাভ একবারই করা যায়, কিন্তু একই মূলধনের ওপর সুদ বারবার নির্ধারণ ও আদায় করা যায়।

সুদ ও মুনাফার পার্থক্য যারা মানতে চান না, পবিত্র কুরআন তাদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। সুদ হারাম হওয়ার বিধানসম্বলিত আয়াত নাযিল হলে জাহেলী যুগের সুদের সমর্থকরা বললো, সুদ আর ক্রয়-বিক্রয় তো একই রকম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বিষয়টি তুলে ধরেছেন এভাবে:

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ

‘যারা সুদ খায় তারা তাদের মতো দণ্ডায়মান যাদেরকে শয়তান তার স্পর্শ দিয়ে পাগল করেছে। এটা এ কারণে যে, তারা বলে, ক্রয়-

বিক্রয় (বেচা-কেনা) তো সুদের মতোই। অথচ আলাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।'[১]

অর্থাৎ তারা সুদ আর মুনাফাকে একই বলে মন্তব্য করেছিল। আল্লাহ তাদের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। অতএব ক্রয়-বিক্রয় আর সুদের মধ্যে যতই মিল খোজার চেষ্টা করাহোক না কেন কিংবা যতই সাদৃশ্য পাওয়া যাক না কেন, দুটি কখনো এক নয়। সুদ হারাম আর ক্রয়-বিক্রয় হালাল। এটা বিশ্বাস করে সে অনুযায়ী ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সব কাজ আঞ্জাম দেওয়া মুমিন-মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

প্রশ্ন: ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের ঋণ দানের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: ইসলামী ব্যাংকের 'বায়' অর্থাৎ-ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির সাথে প্রচলিত ব্যাংকের ঋণ প্রদান পদ্ধতি কোন কোন ক্ষেত্রে মিল থাকতে পারে। এ মিল বা সাদৃশ্য দেখে দুটিকে একই বলে মন্তব্য করা ঠিক নয়। কারণ দুটি পদ্ধতির মধ্যে বাহ্যিকভাবে কিছু মিল থাকলেই যে দুটি এক হয়ে যাবে, এমন নয়।

যেমন– একজন মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে দৈহিক আকার-আকৃতি বিষয়ে মিলে যাওয়া, কথা-বার্তা ইত্যাদি বিষয়ে মিল থাকতেই পারে। মানুষ হিসেবে তাদের মধ্যে এরূপ মিল থাকাই স্বাভাবিক। তাই বলে কি তাদেরকে এক মনে করা যাবে? তাদের পার্থক্যটা আসলে বিশ্বাসে ও কর্মে। অনুরূপভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রচলিত ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকের বহু বিষয়ে সাদৃশ্য থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের আসল পার্থক্য বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতিতে। ইসলামী ব্যাংক আল্লাহর বিধান ও শরীয়তকে মানবজাতির কল্যাণের উৎস রূপে বিশ্বাস করে এবং সে অনুযায়ী যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রচলিত ব্যাংকে এ ধরনের বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় না। মুনাফা অর্জনই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন: ইসলামী ব্যাংক কি একাউন্ট হোল্ডারদেরকে সুদের মতো নির্ধারিত হারেই মুনাফা দেয়?

উত্তর: একটি বহুল প্রচলিত মন্তব্য হচ্ছে, ইসলামী ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে শতকরা নির্ধারিত হারে এ মুনাফা দেওয়া হয়। অর্থাৎ-প্রচলিত ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে যেমন নির্ধারিত হারে সুদ দেওয়া হয়, ইসলামী ব্যাংকও নির্ধারিত হারে মুনাফা দেয়(!), চিন্তার বিষয় যে তা হলে পার্থক্যটা কোথায়?

প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে উপরিউক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ইসলামী ব্যাংকে টাকা রাখলে নির্দিষ্ট হারে (যেমন– ৬%, ৭%, ৯%

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:২৭৫

ইত্যাদি) মুনাফা দেওয়ার কোন পদ্ধতি আদৌ নেই। ইসলামী ব্যাংকে আমানতকারীদের মুনাফা ব্যাংকের অর্জিত মুনাফা ও ক্ষতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং মুনাফার হার সেভাবে উঠা-নামা করে। বছর শেষে প্রাপ্ত লাভের শতকরা হারে জমাকারীদের লাভ দেওয়া হয়। এ লাভ এক বছর এক এক রকম হয়।

প্রশ্নঃ ইসলামী ব্যাংকে টাকা জমা নেওয়া হয় কোন পদ্ধতিতে?

উত্তরঃ ইসলামী ব্যাংক যে পদ্ধতিতে জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা জমা নেয় তার নাম হচ্ছে মুদারাবা। একটি হালাল ব্যবসা পদ্ধতি হচ্ছে মুদারাবা।

প্রশ্নঃ মুদারাবা কী?

উত্তরঃ 'মুদারাবা' এমন এক ব্যবসা পদ্ধতি যেখানে এক পক্ষ মূলধন প্রদান করবে না আর অপর পক্ষ তার শ্রম, মেধা ও দক্ষতা নিয়োজিত করে সে মূলধন দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করবেন। ব্যবসায় লাভ হলে চুক্তি অনুযায়ী আনুপাতিক হারে উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে আর লোকসান হলে তা মূলধনদাতাকে বহন করতে হবে এবং ব্যবসা পরিচালনাকারী তার শ্রমের কোন বিনিময় পাবেন না। মূলধনদাতাকে বলা হয় 'সাহিবুল মাল' আর ব্যবসা পরিচালনাকরীকে বলা হয় 'মুদারিব'। 'মুদারাবা চুক্তিতে কোন পক্ষের (মূলধনদাতা ও ব্যবসা পরিচালনাকারীর) জন্য লাভ নির্দিষ্ট করা যাবে না। কারন মুদারাবা হচেছ লাভ– লোকসানে অংশীদারী ব্যবসা। ব্যবসায় লাভ হতে তা আনুপাতিক হারে (যেমন– ৫০:৫০ বা ৬০:৪০ অথবা ৬৫:৩৫) চুক্তিতে যেরূপ উল্লেখ থাকে সে অনুযায়ী) উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে আর লোকসান হলে মূলধনদাতার মূলধন ক্ষয় হবে আর ব্যবসা পরিচালনাকারীর ক্ষয় হবে শ্রম ও মেধা।

মুদারাবার ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংক জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা জমা নেয়। জমাকারীকে বলা হয় সাহিবুল মাল (মূলধনদাতা), আর ব্যাংক হয় মুদারিব (ব্যবসা পরিচালনাকারী)। জমাকারীর সাথে ব্যাংকের সম্পর্ক হলো 'সাহিবুল মাল' ও 'মুদারিব'। ইসলামী ব্যাংক উক্ত মুদারাবা ফান্ড শরীয়া অনুমোদিত বিভিন্ন পন্থায় বিনিয়োগ করে থাকে। লাভ-লোকসান হিসাব করার জন্য বছরের শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। গ্রাহকের সুবিধাতে বছরের শেষ দিন পর্যন্ত গ্রহককে আটকে না রেখে বিগত বছরের লাভের আলোকে একটা আনুমানিক লাভ গ্রাহকের একাউন্টে দিয়ে দেয়। বছরে শেষে হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর গ্রাহকের একাউন্টে লাভের বাকী অংশ (যদি থাকে) দিয়ে দেওয়া হয়। অনুমিত লাভের চেয়ে প্রকৃত লাভ কম হলে গ্রাহকের একাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া হয়।

মেয়াদী ব্যাংকের বিভিন্ন রকম মেয়াদী একাউন্টে বিভিন্ন হারে লাভ দেওয়া হয়। এটাকে দৃশ্যত প্রচলিত ব্যাংকের মতো নির্ধারিত মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তা নির্ধারিত নয়। বিভিন্ন হিসাব খোলার ফরমের শর্তাবলি পড়লে দেখা যাবে, কোথাও নির্ধারিত হারে লাভ দেওয়ার কথা নেই। লাভ আনুপাতিক হারে বণ্টনের কথা রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন মেয়াদী জমার ক্ষেত্রে যেহেতু মূলধনদাতা (সাহিবুল মাল) ব্যবসা পরিচালনাকারী (মুদারিব)-কে অর্থাৎ ব্যাংককে মূলধন দীর্ঘ মেয়াদের জন্য দেওয়ার নিশ্চয়তা দেয়, সেহেতু ব্যাংক তা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধা লাভ করে। তাই এ সুবিধাকে বিবেচনায় রেখে মুদারাবা চুক্তি করার সময় বিভিন্ন রকম মেয়াদী জমাকারীর একাউন্টে বিভিন্ন অনুপাতে লাভ দেওয়ার কথা থাকে।

প্রশ্ন: জমাকারীদের মুনাফা দেওয়া হয় কিভাবে?

উত্তর: ইসলামী ব্যাংকে টাকা রাখলে নির্ধারিত হারে মুনাফা দেওয়া হয়—এ কথাটি ঠিক নয় বরং মুনাফা দেওয়া হয় চুক্তিতে উল্লিখিত আনুপাতিক হারে (যেমন– ৬৫:৩৫)। হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর এ অনুপাত অনুযায়ী গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে লাভ বণ্টনের পর গ্রাহক কত লাভ পেল তা হিসাব করে বের করা হয়। লাভের শতকরা হার নির্ধারিত হয় হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর। পূর্ব থেকে লাভের হার নির্ধারণ করা হয় না। বিগত বছরের লাভের আলোকে গ্রাহককে আনুমানিক একটা লাভ দেওয়া হয় এবং বছরের শেষে হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর তা সমন্বয় করা হয়।

প্রশ্ন: ইসলামী ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে কিভাবে?

উত্তর: ইসলামী ব্যাংক জমাকারীদের যে মুনাফা দেয় আর প্রচলিত ব্যাংক যে সুদ দেয়, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে এক নয়। কারণ প্রচলিত ব্যাংকে টাকা রাখলে সে টাকা তারা সম্পূর্ণ সুদের ভিত্তিতে খাটিয়ে অর্থ আয় করে। পক্ষান্তরে, ইসলামী ব্যাংক কেবল শরীয়া-অনুমোদিত হালাল পন্থায় বিনিয়োগ করে থাকে। এরূপ পদ্ধতিসমূহকে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি বলা হয়। বায় মুরাবাহা, বায় মুয়াজ্জাল, বায় সালাম, ইসতিসনা, মুশারাকা, মুদারাবা ইত্যাদি বিনিয়োগ পদ্ধতির প্রত্যেকটি ইসলামী ব্যাংকে প্রয়োগের শরীয়া-সম্মত নীতিমালা রয়েছে। সে সকল নীতিমালা পরিপালন করেই ইসলামী ব্যাংক ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করে।

প্রশ্ন: ইসলামী ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ নিতে হলে কি নির্ধারিত হারে লাভ দিতে হয়?

উত্তর: ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে আরেকটি ভুল ধারণা হচ্ছে, ইসলামী ব্যাংক থেকে টাকা বিনিয়োগ নিলে প্রচলিত ব্যাংকের মতোই নির্ধারিত হারে মুনাফা

দিতে হয়। প্রচলিত ব্যাংকের মতো ইসলামী ব্যাংকেও লাভ-লোকসানের কোন বালাই নেই।

প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, প্রচলিত ব্যাংকের সুদ সবসময় নির্ধারিত ও শতকরা হারে ধার্য করা হয় বলে অনেকের মধ্যে এক বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, নির্ধারিত ও শতকরা হারে ধার্য হলেই তা সুদ। এ বদ্ধমূল ধারণা ঠিক নয়। মূলধনের ওপর নির্ধারিত লাভ করার একটি শরীয়া-সম্মত হালাল ব্যবসা পদ্ধতি আছে। পদ্ধতিটি হলো বায় আল-মুরাবাহা।

প্রশ্ন: মুরাবাহা কী?

উত্তর: ইসলামী ব্যাংক যেসব হালাল পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে তার মধ্যে একটি হচ্ছে মুরাবাহা পদ্ধতি। মালামাল ক্রয়ের পর ক্রয়মূল্যের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ যোগ করে তা পুনরায় বিক্রি করাকে 'বায় মুরাবাহা' বলে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ কেবল গ্রাহকের ক্রয় আদেশের বিপরীতে মুরাবাহা পদ্ধতি অনুশীলন করছে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক সর্বাগ্রে গ্রাহকের ক্রয় আদেশের বিপরীতে মুরাবাহা পদ্ধতি অনুশীলন করছে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক সর্বাগ্রে গ্রাহকের নিকট থেকে দরখাস্ত আকারে মালামালের অর্ডার নেয়। অর্ডার অনুযায়ী ব্যাংক বাজার থেকে নগদমূল্য ক্রয়মূল্যের ওপর নির্দিষ্ট লাভ ধার্য করে গ্রাহকের নিকট তা বিক্রি করে। এ ক্ষেত্রে থোক অথবা শতকরা যে কোন পদ্ধতিতে লাভ ধার্য করা শরীয়তসম্মত। এ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে মুনাফা নির্ধারিত হওয়া। মুনাফা নির্ধারিত না হলে মুরাবাহা শুদ্ধ হবে না।

প্রশ্ন: ইসলামী ব্যাংক কি লাভ-লোকসানের অংশ বহন করে?

উত্তর: ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ হল, ইসলামী ব্যাংক কোন লোকসান বহন করে না। প্রকৃতপক্ষে উপরের যে অভিযোগটি করা হয়েছে তা আংশিক সঠিক, পুরোপুরি সঠিক নয়। অর্থাৎ গ্রাহকের লোকসান হলে ইসলামী ব্যাংক তা কখনো বহন করে না এমন নয়।

মনে রাখতে হবে, ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামের বিধান ও আইন অনুসরণ করেই তাকে ব্যবসা পরিচালনা করতে হয়। ইসলামী শরীয়ায় যেসব পদ্ধতিতে ব্যবসা করা বৈধ, ইসলামী ব্যাংক কেবল সে সকল ব্যবসা পদ্ধতিই অনুসরণ করে থাকে। ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতিতে যে বিনিয়োগ করে, সেখানে আনুপাতিক হারে লাভ-লোকাসনের অংশ বহন করে থাকে।

প্রশ্ন: ক্রয়-বিক্রয় তথা বিনিয়োগের হালাল পদ্ধতি কয়টি ও কি কি?

উত্তর: ইসলামী শরীয়তের যেসব পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যবসা করা বৈধ, তা প্রধানত ৩ প্রকার। যথা–

১. ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি,
২. অর্থায়ন পদ্ধতি ও
৩. ইজারা পদ্ধতি।

প্রশ্ন: ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির ধর্মই কি লোকাসন বহন না করা?

উত্তর: ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির ধর্মই হচ্ছে পণ্য বিক্রি করা এবং ক্রেতাকে তা বুঝিয়ে দেওয়ার পর যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, পুড়ে যায়, হারিয়ে যায় কিংবা ক্রেতা তা অন্যত্র কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হওয়ার ফলে তার কোন লোকসান হয়, সে লোকসান কখনো বিক্রেতা বহন করে না।

প্রশ্ন: ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক কি লোকসান বহন করে না?

উত্তর: ইসলামী ব্যাংক লোকসান বহন করে না—এ ধরনের ঢালাও মন্তব্য করার পূর্বে আমাদের দেখা উচিত ব্যাংকের সাথে গ্রাহক কি ধরনের লেন-দেন করেছে? ব্যাংক ও গ্রাহকের চুক্তিতে কি ধরনের পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। ব্যাংক থেকে গ্রাহক কোন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ গ্রহণ করেছেন। গ্রাহক যদি ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি অর্থাৎ বায় মুরাবাহা অথবা বায় মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিনিয়োগ নিয়ে থাকেন তা হলে গ্রাহকের কোন লোকসান হলে তা ব্যাংকের বহন করার প্রশ্ন আসে না। কারণ এ পদ্ধতিতে ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের সম্পর্কে হচ্ছে বিক্রেতা-ক্রেতা সম্পর্ক (অর্থাৎ-ব্যাংক বিক্রেতা আর গ্রাহক ক্রেতা)। ব্যাংক নগদ মূল্যে বাজার থেকে মালামাল ক্রয় করে গ্রাহকের নিকট তা বিক্রি করেছে এবং বাকীতে মূল্য পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সময় দিয়েছে। অতএব ব্যাংক গ্রাহকের নিকট বিক্রিত মালের মূল্য বাবদ যে অর্থ পাবে, তা গ্রাহক দিতে বাধ্য। এ মাল পরবর্তীতে বিক্রি করতে গিয়ে গ্রাহকের লাভ-লোকসান দেখার কোন প্রয়োজন ব্যাংকের নেই। লোকসান হলেও না এবং লাভ হলেও না। অতএব ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করে, পরবর্তীতে গ্রাহকের লোকসান ব্যাংককে বহন করতে বলা ন্যায়সঙ্গত নয়। এ ক্ষেত্রে লোকসান বহন না করার কারণে ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংককে একাকার করে ফেলা উচিত নয়। তবে সঙ্গত কারণে লোকসান হলে ব্যাংক ক্ষেত্রবিশেষ মুনাফা মওকুফ করতে পারে এবং করেও থাকে।

প্রশ্ন: ভাড়া (ইজারা)-এ ক্ষেত্রেও কি ইসলামী ব্যাংক লোকসান বহন করে না?

উত্তর: অনেক সময় ইসলামী ব্যাংক কোন মেশিনারিজ বা স্থায়ী সম্পদ গ্রাহকের নিকট ভাড়া দেওয়া ও বিক্রি করার চুক্তি করে। এ ধরনের ভাড়া

(ইজরা) চুক্তিতে ব্যাংকের নিকট থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করলে ব্যাংক লোকসান বহন করতে বাধ্য নয়। এ পদ্ধতিতে গ্রাহকের লাভ-লোকসানের অংশীদার ব্যাংক হয় না।

প্রশ্নঃ মুশারাকার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকেই কি লোকসান বহন করতে হয়?
উত্তরঃ অংশীদারী ব্যাবসা পদ্ধতিটি ক্রয়–বিক্রয় পদ্ধতির মত নয়। অংশীদারী পদ্ধতিকে শরীয়তে 'মুশারাকা' বলা হয়। এ ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে মূলধনের যোগদান দেয়। ব্যবসায় লাভ হলে চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন হবে আর লোকসান হলে পুঁজির আনুপাতিক হারে সবাইকে বহন করতে হবে। কেউ ইসলামী ব্যাংক হতে মুশারাকা চুক্তির ভিত্তিতে বিনিয়োগ গ্রহণ করার পর তার ব্যবসায় বাস্তবে যদি কোন লোকসান হয় তা হলে ইসলামী ব্যাংককে সে লোকসান পুঁজির আনুপাতিক হারে বহন করতে হয়। এটাই শরিয়তের বিধান।

প্রশ্নঃ মুদারাবার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকে কি লোকসান বহন করতে হয়?
উত্তরঃ মুদারাবা পদ্ধতিতে কোন গ্রাহক বিনিয়োগ করার পর সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় লোকসান হলে তার পুরোটাই ইসলামী ব্যাংকেই বহন করতে হবে।

প্রশ্নঃ জমাকারীদের সব সময় লাভ দেওয়া হয় কিভাবে?
উত্তরঃ ইসলামী ব্যাংক লোকসান বহন করে না—এ কথা বলতে গিয়ে অনেকে বলে থাকেন, বলা হয়, ইসলামী ব্যাংক ব্যবসা করেন। আমরা জানি, ব্যবসায় লাভ-লোকসান আছে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক জমাকারীদের সব সময় লাভ দেয়, লোকসান দেখায় না। এটাতো প্রচলিত ব্যাংকের মতোই। তারাও তো কখনো গ্রাহককে লোকসান বহন করার কথা বলে না।

প্রশ্নঃ লোকসান হলেও গ্রাহকরা কি তা সরাসরি প্রত্যক্ষ করে?
উত্তরঃ আসলে ইসলামী ব্যাংকে যেসব ক্ষেত্রেই শুধু লাভ হয়, তা নয়। কোথাও কোথাও লোকসানও হয়। ব্যাংকের সকল শাখা লাভ করে না। কোন কোন শাখায় লোকসানও হয়। কিন্তু সকল শাখা মিলে লাভ হয়। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক অনেক খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। তম্মধ্যে কিছু কিছু খাতে লোকসানও হয়, কিন্তু অধিকাংশ খাতেই লাভ হয়। ফলে গ্রাহককে লোকসান বহন করতে হয় না। আর ব্যবসায় লোকসান না হলে হালাল হবে না-এমন কোন কথাও শরিয়তে নেই। ইসলামী ব্যাংক আল্লাহর রহমতে এ পর্যন্ত সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে ব্যাংক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করে আসছে। তাই এখনও কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়নি। এ জন্য প্রতি বছরই আমানত কারীদের কিছু না কিছু মুনাফা দিয়ে আসছে। তবে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রথম

দিকে শেয়ার হোল্ডারদের ডিভিডেন্ড কিন্তু কোন কোন বছরে একেবারেই দেওয়া হয়নি।

প্রশ্নঃ ইসলামী ব্যাংক কি সকল পণ্যে একই ধরণের লাভ নির্ধারণ করে?

উত্তরঃ ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ হল, বলা হয়, ইসলামী ব্যাংক সুদ নেয়না, ব্যবসা করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বাস্তবে যারা ব্যবসা করছেন তারা সকল পণ্যে একই রকম লাভ করেন না। বিভিন্ন আইটেমে বিভিন্ন রকম লাভ করেন। আবার তারা সকল ক্রেতার থেকে সমান দাম রাখেন না। অথচ ইসলামী ব্যাংক থেকে কোন মালামাল ক্রয় করা হলে সকল পণ্যের একই লাভ দিতে হয়। চাল, পিয়াজ, মরিচ, ডাল, আলু, রড, সিমেন্ট, কয়লা ইত্যাদি পণ্যে ১১.৫% বা ১২%। ইসলামী ব্যাংক সত্যিকার অর্থে ব্যবসা করলে তার সাথে ব্যবসায়ীদের মিল নেই কেন?

ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করার পূর্বে দেখতে হবে লাভ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শরীয়তের নীতি কি? বিভিন্ন পণ্যে বিভিন্ন রকম লাভ করতে হবে কিংবা কোন পণ্যে কত লাভ করতে হবে এমন কোন কথা কুরআন-হাদীসে নির্ধারিত আছে কি? ইসলামী ব্যাংক সেরূপ কোন নির্দেশ বা নীতিকে লংঘন করছে কি না? সেটাই হলো বিবেচ্য বিষয়। কোন পণ্যে কত লাভ করা যাবে-এরূপ কোন নির্দেশনা আমরা কুরআন-হাদীসে পাই না। অর্থাৎ চালে কত, ডালে কত, ধান, আটা, যব, লবণ কোনটিতে কত লাভ করা যাবে, এ সম্পর্কে কোন নির্দেশনা কুরআন-হাদীসে নেই। আবার সকল পণ্যে এক রকম লাভ করা যাবে না-এরূপ কোন নিষেধাজ্ঞাও নেই। আসলে শরীয়তে বিষয়টিকে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। কারণ লাভ নির্ণয়ের বিষয়টি নির্ভর করে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে।

প্রশ্নঃ পণ্যভিত্তিক লাভ নির্ধারণে কি সমস্যা রয়েছে?

উত্তরঃ ইসলামী ব্যাংক যদি পণ্য উৎপাদনের মওসুম ইত্যাদি বিবেচনা করে লাভ নির্ধারণ করতে যায়, তা হলে ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় পণ্যের তালিকা প্রস্তুত করে লাভের হার নির্ধারণ করে সার্কুলার ইস্যু করা বাস্তবসম্মত নয়। কারণ প্রতিদিন প্রণ্যের দাম উঠা-নামা করে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় পণ্যের চাহিদা ও যোগানের ওপর এটা নির্ভর করে। প্রতি মুহূর্তে দাম উঠা-নামা করে। আর কোন সার্কুলার ইস্যু না করে লাভ নির্ধারণের বিষয়টি যদি শাখা ব্যবস্থাপকের ওপর ছেড়ে দেয়, তা হলে ব্যাংকের ব্যবসা পরিচালনায় কোন শৃঙ্খলা থাকবে না। অনেক ক্ষেত্রে কম আবার কারো ক্ষেত্রে বেশি লাভ ধরবেন। এতে যেমন দুর্নীতির পথ খুলতে পারে,তেমনি গ্রাহকদের ও ইনসাফ

থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সুদূরপ্রসারী ফলাফলের কথা চিন্তা করলে এ পদ্ধতিটি ব্যাংক ও গ্রাহক কারো জন্যই কল্যাণকর নয়।

প্রশ্ন: ইসলামী ব্যাংক কি দরিদ্র ক্রেতাদের থেকে কম লাভ করে থাকে?

উত্তর: বাস্তব জটিলতার কারণে ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন পণ্যের লাভের হার বিভিন্ন রকম করতে না পারলেও গ্রাহকদের আর্থিক অবস্থার বিচারে লাভ কম-বেশি করে থাকে। যেমন– পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় যেসব দরিদ্র জনগোষ্ঠী ইসলামী ব্যাংক থেকে মালামাল ক্রয় করে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে লাভের হার খুব কম।

প্রশ্ন: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকের সুদমুক্ত লেন-দেন কিভাবে হয়?

উত্তর: অনেকে মনে করেন, ইসলামী ব্যাংক যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের লেন-দেন সুদভিত্তিক, সেহেতু ইসলামী ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সুদের ভিত্তিতেই লেন-দেন করতে হয়। এ ছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশি ব্যাংকগুলো সুদ ছাড়া অন্যকিছু বোঝে না। কাজেই কেউ কেউ মনে করছেন, ইসলামী ব্যাংক যতই দাবী করুক তা সুদমুক্ত, আসলে তা সম্ভব হচ্ছে না। এ ধারাণাও সঠিক নয়, কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইসলামী ব্যাংককে সুদমুক্ত পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। যেমন– ইসলামী ব্যাংকের বেলায় SLR-এর পরিমাণ মোট আমানতের শতকরা ১০% নগদে কমার অনুমতি দিয়েছে। এ ছাড়া ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে এ পর্যন্ত কোন Refinance বা ঋণ সহায়তা নিতে হয়নি। তবে প্রয়োজনবোধে মুদারাবা পদ্ধতিতে অর্থাৎ সুদমুক্তভাবে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সুদ আয় হয় তা ইসলামী ব্যাংক অর্জিত মুনাফার সাথে একীভূত না করে আলাদাভাবে সন্দেহযুক্ত আয় হিসেবে নিয়ে তা জনহিতকর কাছে ব্যয় করে।

প্রশ্ন: খেলাপী গ্রাহকের ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপ এর ব্যাপারে কি কোন ভুল ধারণা আছ?

উত্তর: ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ হল, বলা হয়, ইসলামী ব্যাংক চক্রবৃদ্ধি হারে লাভ নেয়। কোন গ্রাহক নির্ধারিত সময়ে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে ব্যাহত হলে অতিরিক্তি সময়ের জন্য পাওয়ার টাকার ওপর নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ আরোপ করে।

ইসলামী ব্যাংক মেয়াদোত্তীর্ণ পাওনা টাকার ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করে—এ কথা সত্য। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক কেন ক্ষতিপূরণ আরোপ করে? কিভাবে করে? এ ব্যাপারে শরীয়া-বিশেষজ্ঞ ও বিশ্ববিখ্যাত আলিমগণ ও ফকীহগণ কি বলেছেন? এরূপ ক্ষতিপূরণ আরোপ করার পক্ষে শরীয়তের কোন দলীল রয়েছে কি না? এসব বিষয় হয় তো কেউ চিন্তা করেন না। ফলে তারা বিষয়টি প্রচলিত ব্যাংকের চক্রবৃদ্ধির সাথে গুলিয়ে ফেলেন।

প্রশ্ন: নির্ধারিত সময়ে বিনিয়োগ পরিশোধ না করলে শরীয়তের বিধান কি?
উত্তর: পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

> 'ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অসচ্ছল হয়ে পড়ে তা হলে তাকে সচ্চলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দাও, আর সাদাকা করা (এ ধরনের অসচ্ছল ব্যক্তির ঋণ মাফ করে দেওয়া) তোমার জন্য উত্তম।'[১]

দেনাদার অসচ্ছল হলে তাকে মাফ করাকে পবিত্র কুরআনে উত্তম বলা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে টাকা ধার দিয়ে পাওনা টাকা মাফ করা আর মুদারাবা ব্যবসা করার চুক্তিতে মানুষের নিকট থেকে টাকা জমা নিয়ে সেই টাকা কাউকে প্রদান করে তা (মুদারিব কর্তৃক) মাফ করে দেওয়া এক কথা নয়। ইসলামী ব্যাংক যে টাকা খেলাপী গ্রাহকের নিকট পাওনা, তা কোন ব্যক্তি বিশেষের টাকা নয়। ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমাকারীর প্রদত্ত টাকা। তারা ব্যাংকে টাকা দিয়েছে ব্যবসা করার জন্য, মানুষকে টাকা দিয়ে তা মাফ করে দেওয়ার জন্য নয়। অতএব কোথাও মাফ করার প্রয়োজন হলে তার যথার্থ শরয়ী কারণ থাকা দরকার এবং অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন: প্রকৃতই দেনাদার যদি অসমর্থ হয় তবে কি করা হয়?
উত্তর: কোন গ্রাহক যদি সঙ্গত কারণে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে প্রকৃত অর্থেই অসমর্থ হয়ে পড়ে, তবে ইসলামী ব্যাংকের উচিত তাকে সময় বাড়িয়ে দেওয়া। অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক দেখবে গ্রাহক সত্যিকার অসমর্থ হয়ে পড়েছে কি-না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ব্যাংকের পাওনা পরিশোধকে গ্রাহক সর্বোচ্চ জরুরি বিষয় মনে করেন না এবং বিনিয়োগের টাকা পরিশোধে তার

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:২৮০

সদিচ্ছারও অভাব রয়েছে। এ জন্য দেখা যায়, ব্যাংকের ঋণ খেলাপীরদের মধ্যে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গ্রাহকের সংখ্যা কম।

প্রশ্ন: গ্রাহক/বিনিয়োগকারী থেকে ক্ষতি কেন?

উত্তর: এরূপ গ্রাহকদের যদি সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয় তা হলে খেলাপীর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়বে এবং খেলাপী কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত হবে। ফলে ব্যাংকের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় ব্যাংকের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে এরূপ খেলাপী গ্রাহকদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-স্বরূপ 'ক্ষতিপূরণ' পদ্ধতিটি ইসলামী ব্যাংকে চালু করা হয়।

বাংলাদেশে ব্যাংকিং সেক্টরে ঋণ-খেলাপী কালচার অত্যন্ত ব্যাপক এবং খেলাপীদের থেকে টাকা দ্রুত আদায়ের বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই। এ কারণে এদেশে ইসলামী ব্যাংকে ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি চালু হয়েছে। এ পদ্ধতিতে একজন গ্রাহক যথাসময়ে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ না করলে মেয়াদোত্তীর্ণ হবার পর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়। ফলে খেলাপী গ্রাহক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালায়।

প্রশ্ন: ক্ষতিপূরণের টাকা কোন খাতে ব্যয় করা হয়?

উত্তর: ক্ষতিপূরণ খেলাপী গ্রাহকদের বিরুদ্ধে একটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। তা আরোপ করার ইখতিয়ার ইসলামী ব্যাংকের হাতে না থেকে তৃতীয় পক্ষের হাতে থাকা উচিত। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের এ ক্ষতিপূরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিশেষ কমিটি রয়েছে। একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, একজন বিশিষ্ট আইনজীবী, একজন অর্থনীতিবিদ ও একজন শরীয়া-বিশেষজ্ঞ (শরীয়া কাউন্সিলের প্রতিনিধি) সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত। তা ছাড়া এ খাত হতে প্রাপ্ত/আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকের হালাল আয় থেকে পৃথক করে শরীয়া কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শরীয়া-অনুমোদিত পন্থায় জনহিতকর কাজেই ব্যয় করা হয়।

প্রশ্ন: ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন কখন কেন প্রতিষ্ঠা করা হয়?

উত্তর: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠার পরপরই ১৯৮৩ সালের ৪ জুলাইয়ে ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের সিদ্ধান্তক্রমে ব্যাংকের মোমোরেন্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন ১০৪ নং ধারা অনুযায়ী 'সাদাকা তহবীল' নামে একটি দাতব্য তহবীল গঠন করা হয়। সাদাকা তহবীলের মাধ্যমে আর্ত-মানবতার সেবা, বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্থ মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে সমাজ সংস্কার ও সমাজ উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ কার্যক্রমের পরিধি ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ধারায় বিস্তার লাভ করতে

থাকে। এ বিস্তৃত কর্ম-পরিধির প্রেক্ষাপটে ১৯৯১ সালের ২০ মে সাদাকা তহবীলের নাম পরিবর্তন করে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন করা হয়। ফাউন্ডেশন স্বতন্ত্র হিসাব ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রেজিস্ট্রার অব জয়েন্টস্টক কোম্পানিজ এবং এনজিও-বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধনকৃত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

প্রশ্নঃ এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী?
উত্তরঃ

- আর্ত-মানবতার সেবা,
- শিক্ষা সম্প্রসারণ, গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষার বিকাশ সাধন,
- আত্ম-কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি,
- স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধার সম্প্রসারণ,
- শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সাধন,
- ইসলামী মতাদর্শের প্রচার, প্রসার ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহদান,
- বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনগণের মধ্যে সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি এবং
- মানস সম্পদ উন্নয়ন।

প্রশ্নঃ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের আয়ের উৎস কী?
উত্তরঃ

- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যাকাত,
- দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুদান,
- শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে সুদমুক্ত নয় ইসলামী ব্যাংকের এমন আয়সমূহ (এসব আয় ব্যাংকের মুনাফার অন্তর্ভুক্ত না করে জন্যকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার জন্য ফাউন্ডেশনে প্রদান করা হয়।),
- ফাউন্ডেশনের নিজস্ব প্রকল্প থেকে আয় ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যাকাত, অনুদান, সম্পূর্ণরূপে সুদমুক্ত নয়—ইসলামী ব্যাংকের এমন আয় এবং প্রকল্প আয়ের হিসাবসমূহ সম্পূর্ণ আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হয় এবং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যথাযথভাবে ব্যয় করা হয়।

প্রশ্নঃ আর্থ-সামাজিক কল্যাণ ইসলামী ব্যাংকের ফাউন্ডেশন কি কি কার্যক্রম হাতে নিয়েছে?

উত্তরঃ দারিদ্র, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, ভিক্ষাবৃত্তি, অপুষ্টি, কুসংস্কার, সন্ত্রাস, সামাজিক অস্থিরতা ইত্যাদি সমস্যায় বাংলাদেশ বিশেষভাবে জর্জরিত। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন দেশের দুঃস্থ, অসহায় ও সমস্যাগ্রস্ত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব এবং বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম ও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এসব প্রকল্প নিম্নরূপঃ

১. ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল,
২. ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতাল,
৩. ইসলামী ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি,
৪. ইসলামী ব্যাংক মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ,
৫. মনোরমঃ ইসলামী ব্যাংক ক্রাফটস অ্যান্ড ফ্যাশনস,
৬. ইসলামী ব্যাংক ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড ডিস্যাবলড রিহ্যাবিলিটিশন সেন্টার,
৭. সার্ভিস সেন্টার,
৮. বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্র ও
৯. দুঃস্থ মহিলা পুনার্বসন প্রকল্প।

নিয়মিত কার্যক্রম

১. আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম,
২. শিক্ষা কার্যক্রম,
৩. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কার্যক্রম,
৪. মানবিক সাহায্য দান কার্যক্রম,
৫. ত্রাণ ও পুনবার্সন কার্যক্রম ও
৬. দাওয়া কার্যক্রম।

[সূত্রঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের শরীয়া কাউন্সিলের ফিকহ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী ব্যাংকিং সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব ও ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচিতি]

ইসলামী বীমা বা তাকাফুল

প্রশ্নঃ বীমা (তাকাফুল) কী?

উত্তরঃ বীমা শব্দটির ঐতিহ্যগত প্রতিশব্দ হল 'ইন্স্যুরেন্স'। আরবিতে বলা হয় তাকাফুল। যার অর্থ সমবায়, সংহতি বা ঐক্য। কৌশলগত দিক থেকে বীমার সংজ্ঞা এভাবে করা যায় যে, 'বীমা হচ্ছে এমন এক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে একই ধরনের বহুসংখ্যক ঝুঁকির সমাবেশ করে সদস্যদের নিকট থেকে যার যার ঝুঁকির অনুপাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (যাকে প্রিমিয়াম বলে) আদায়ের মাধ্যমে একটি সাধারণ তহবীল গড়ে তোলা হয় এবং এ দলভুক্ত কোন সদস্যের দুর্ভ্যাগ্যবশত ক্ষতির সম্মুখীন হলে উক্ত তহবীল থেকে তার সে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করা হয়।'

সুতরাং বীমার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কোন দলের সকল সদস্য কর্তৃক সে দলভুক্ত কোন সদস্যের ক্ষতির অংশ বহন করা। বস্তুত এক সদস্যের ক্ষতিকে বহু সদস্যের মাঝে সুষমভাবে বণ্টনের নাম হচ্ছে বীমা। সুতরাং 'বীমা হচ্ছে কোন দলভুক্ত ভাগ্যহত কোন সদস্যের দলের সদস্য কর্তৃক ক্ষতিপূরণ করার একটি আর্থিক ব্যবস্থা।'

প্রশ্নঃ ইসলামী শরীয়তে বীমা কি জায়েয?

উত্তরঃ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের নাম। মানুষ দোলনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত সমস্যার সম্মুখীন হবে সকল সমস্যার সমাধান ইসলামে রয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যা মানুষের অন্যতম প্রধান সমস্যা। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ ইসলামী শরীয়তের আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। ব্যাংকের পাশাপাশি বীমা আধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক উপাদান হিসেবে আজ স্বীকৃত। তাই আধুনিক অর্থনীতির বীমা ব্যবস্থার সাথে ইসলামের মূল আকীদার (কুরআন-হাদীস) সঙ্গে কোথায় কোথায় সংঘাত তা নিরূপণপূর্বক আজ ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ

ইসলামী ব্যাংকের ন্যায় ইসলামী বীমা পদ্ধতিও প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। ইসলামী অর্থনীতির নীতিমালার মূল ভিত্তি হচ্ছে কুরআন ও হাদীস। এর পাশাপাশি রয়েছে ইজমা ও কিয়াস। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা মূলত ইজমা ও কিয়াসের ফসল। ইসলামী শরীয়তে কিভাবে বীমা জায়েয আমরা মূলত ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে তা নিরূপন করব। বীমার মতো পদ্ধতিকে ইসলাম কিভাবে অনুমোদন করে, এর সমর্থনে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে আলোচনায় স্থান দেব।

প্রথমত 'দিয়াত' পদ্ধতি ইসলামে 'দিয়াত' বা 'রক্তপণ' প্রথা বৈধ। এ সম্পর্কে কুরআনে সূরা আন-নিসার ৯২ আয়াতে বলা হয়েছে,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ
لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ؕ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۖ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۹۲﴾

'মুসলমানের কাজ নয় মুসলমানকে হত্যা করা, কিন্তু ভুলক্রমে! যে ব্যক্তি মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে। কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয় (তা ভিন্ন কথা)। অতঃপর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং সে যদি তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি না পারবে সে আল্লাহর নিকট থেকে গুনাহ মাফের জন্য উপর্যপুরি দুই মাস রোযা রাখবে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।'[১]

উল্লিখিত আয়াতটি থেকে আমরা দুটি ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি:

১. **মানুষের অকাল মৃত্যুতে তার ওপর নির্ভরশীলদের টাকার প্রয়োনজীয়তা:** এখানে একথা সুস্পষ্ট যে, যখন কোন ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করবে সে ক্ষেত্রে কিসাসের বিধানের পরিবর্তে দিয়াত বা রক্তপণের বিধানের নির্দেশ দিয়ে ইসলাম মানুষকে এ

[১] আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা*, ৪:৯২

শিক্ষা দিতে চায় যে, যখন অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে একটি সমস্যা সৃষ্টি হল তখন আরেকটি সমস্যার জন্ম হবে। বরং এর উত্তম সামাধান হল হত্যাকারী ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিজেকে হত্যার অপরাধ থেকে দায়মুক্ত করা। ইসলামের এই বিধান মূলত পরোক্ষভাবে মানুষের অকাল মৃত্যুতে তার ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের আর্থিক প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বকে স্বীকার করে।

২. **বীমার মতো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি:** আলাহ্‌র রাসূল (সা.) দিয়াত পদ্ধতির বাস্তব কার্যকারিতার ক্ষেত্রে দিয়াত পরিশোধের দায়িত্ব হত্যাকারীর নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের ওপর অর্পন করেছেন। সুন্নাহের পরিভাষায় এ ধরনের আত্মীয়-স্বজনদের বলা হয় আকিলা। আকিলার ওপর দিয়াত পরিশোধ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আকিলার ওপর দিয়াত পরিশোধ করার দায়িত্ব করার পেছনে যে যুক্তি রয়েছে তা হচ্ছে হত্যাকারীর ওপর এককভাবে এ অর্থ পরিশোধ করা সম্ভব নাও হতে পারে এবং এ জন্য সে দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে।

যাতে ক্ষতিপূরণের অর্থ অপরিশোধিত থেকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ভাবধারাকে সমুন্নত রাখার দৃষ্টিভঙ্গিও এতে রয়েছে তা হচ্ছে হত্যাকারীর ওপর এককভাবে এ অর্থ পরিশোধ করা সম্ভব নাও হতে পারে এবং এজন্য সে দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামে 'আকিলার সংঙ্গায় বলা হয়েছে যে, আকিলা হচ্ছে হত্যাকারী ব্যক্তির পুরুষ আত্মীয়-স্বজনের নাম। কোন মুসলমান যখন অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানের মৃত্যুর কারণ হয়, তখন হত্যা কারীর যেসব আত্মীয়-স্বজনকে আরোপিত জরিমানা পরিশোধ করতে হয় তারা হচ্ছে আকিলা। হাদীস ও ফিকহ গ্রন্থসমূহে হত্যাকারীর আত্মীয়-স্বজনের ওপর আরোপিত দিয়াত পরিশোধের দায়িত্ব অর্পণের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে অনিচ্ছাকৃত হত্যাকারীর সাথে সংহতি প্রকাশ করা। হত্যাকারী দিয়াত পরিশোধে অসমর্থ হতে পারে অথবা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করতে গিয়ে সে নিঃস্ব হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া যদি ধনী হয়, তাহলে তার দ্বারা পূণরায় অনুরূপ ভুল হওয়ার আশঙ্কা থেকে যেতে পারে। সুতরাং আকিলা হচ্ছে ঝুঁকির পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে মোকাবেলা করা।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে, ওই হত্যাকারী ব্যাক্তির সম্প্রদায়ের সকল লোক আকিলার অন্তর্ভুক্ত। আকিলার এ ধারণা সমাজের মানুষে মানুষে সুসম্পর্কেরও উত্তম সমঝোতা কায়েমের প্রতিষ্ঠানগুলো

আকিলার পদ্ধতিরই সম্প্রসারিত রূপ। সুতরাং সূরা আন-নিসার উলিখিত আয়াতে মানুষের অকাল মৃত্যুতে তার ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের অর্থের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয় এবং সে অর্থ এককভাবে পরিশোধের পরিবর্তে সামাজিকভাবে পরিশোধের গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন ব্যাক্তি অপর ব্যাক্তি দ্বারা নিহত হলে তার পরিবার অর্থ পাবে। কিন্তু সে যদি স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু বরণ করে অর্থাৎ দূর্ঘটনায়, বন্যা, সাইক্লোন ও বিভিন্ন ধরণের রোগে, তাহলে তার পরিবারকে কে টাকা দেবে? সে ক্ষেত্রে কি তার ওপর নির্ভরশীলদের অর্থের প্রয়োজন নেই? অবশ্যই আছে। সে জন্য দরকার হচ্ছে একটি বিকল্প পদ্ধতির। আর সে পদ্ধতি হচ্ছে বীমা।

[সূত্রঃ ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে জীবন বীমা, সৈয়দ সরওয়ার সিদ্দিকী]

প্রশ্নঃ ইসলামী বীমার উপাদান কি? বীমা-ব্যবস্থা ইসলাম সম্মত হওয়ার শর্ত কি?

উত্তরঃ ইসলামী বীমার উপাদান

ইসলামী বীমা ব্যবস্থার প্রধান উপাদানগুলো হবেঃ

১. পরস্পরের মধ্যে দায়িত্বের অংশীদারিত্ব,
২. ক্ষতি বা লোকসান মেটানোর যৌথ ব্যবস্থা,
৩. সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং
৪. পারস্পরিক সংহতি ইত্যাদি।

বীমা ব্যবস্থা ইসলামসম্মত হওয়ার শর্ত

১. বীমা পলিসি গ্রহণকারীগণ তাদের নিজেদের মধ্যে একে অন্যের কল্যাণের জন্য সহযোগিতা করবে।
২. প্রত্যেক পলিসি গ্রহণকারী তাদের মধ্যে যার প্রয়োজন তাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্য চাঁদা প্রদান করবে।
৩. এটা একটি চাঁদাভুক্তির আওতায় পড়ে, যার লক্ষ্য হলো লোকসান ভাগ করে নেওয়া এবং দায়-দেনাকে গোষ্ঠীগত তহবীল ব্যবস্থার অধীনে ছড়িয়ে দেওয়া।
৪. চাঁদা ও ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব অনিশ্চয়তার উপাদান পরিহার করতে হবে।

প্রশ্নঃ ইসলামী বীমার বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তরঃ ইসলামী বীমার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

১. ব্যবসায়িক লেনদেন ইসলামী শরীয়া মোতাবেক সমবায় নীতিতে পরিচালিত হয়। প্রচলিত সনাতন বীমা-ব্যবস্থার সকল সুযোগ-সুবিধা ঠিক রেখে ইসলামী বীমা তার কর্মকাণ্ড যেমন– বিপণন, বীমার শর্ত নির্ধারণ,

পুনঃবীমাকরণ, তহবীল বিনিয়োগ, মুনাফা বণ্টন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ার নীতি অনুযায়ী পরিচালিত করে থাকে।

২. ইসলামী বীমায় পলিসি গ্রহণকারীদের বিশেষ ভূমিকা থাকে। পলিসি গ্রহণকারীগণ অংশীদারের মর্যাদা পায়। মুনাফায় অংশ পাওয়ার অধিকার পলিসি হোল্ডারদের যেমন অংশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তেমনি লোকসান হলেও তাঁদের তা বহন করতে হয়।

৩. ইসলামী বীমা তহবীল বিনিয়োগ করে অর্থনীতির হালাল খাতসমূহে। শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন খাতে ইসলামী বীমা কোম্পানি তার তহবীল বিনিয়োগ করতে পারেনা। বরং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ খাতে তহবীল বিনিয়োগ করার উদ্যোগে গ্রহণ করে থাকে। কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে বিশেষ বিশেষ প্রকল্পের অধীনে তহবীল বিনিয়োগ করার উদ্যোগ ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিতে হয়।

৪. ইসলামী বীমার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে যে এ ধরনের বীমা প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতেই সুদভিত্তিক কোন বিনিয়োগ করবে না। সুদ যেহেতু হারাম বা নিষিদ্ধ সেহেতু ইসলামী বীমা কোন পরিস্থিতিতেই সুদ আয় করার জন্য বিনিয়োগ করতে পারে না। তার সকল বিনিয়োগ ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি বিশেষ করে মুদারাবা বা মুশারাকা পদ্ধতিতে করে থাকে।

৫. ইসলামী বীমার পলিসিতে কোন রকম অস্বচ্ছতা বা 'গারার' এবং জুয়ার মত নিষিদ্ধ জিনিসের উপাদান থাকতে পারে না। স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা হবে এ ধরনের বীমার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

৬. ইসলামী বীমার দুটি পৃথক ও সুস্পষ্ট হিসাব (accounts) রক্ষা করতে হয়। তাহলো শেয়ার হোল্ডারদের হিসাব ও পলিসি হোল্ডারদের হিসাব। এ দুটি হিসাব নির্ধারিত নীতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হারে নিস্পন্ন হয়।

৭. তাবাররু হলো ইসলামী বীমার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আর এ তাবাররু বীমাকে ইসলামী চরিত্র দান করেছে। ইসলামী বীমা বা তাকাফুল যৌথ জামানত এবং পারস্পরিক সাহায্য প্রদানের দায়-দায়িত্ব পালনার্থে তাকাফুল অংশগ্রহণকারীগণ তাঁদের তাকাফুল কিস্তির বা তাকাফুল চাঁদার নির্দিষ্ট অংশ তাবাররু হিসাব দান করার অঙ্গীকার দিয়ে থাকেন। এটি মুদরাবা পদ্ধতিতে স্বাভাবিক চুক্তির অতিরিক্ত। চুক্তিতে তাবাররুর উদ্দেশ্য সহজে নির্ণয় করা যায় যে, এটি অংশগ্রহণকারীগণকে তাদের সাথী অংশগ্রহণকারীর ক্ষতিপূরণে আন্তরিক সহায়তাদানে তাঁদের কৃত ওয়াদার যথাযথ বাস্তবায়নে সক্ষম করে তোলে। সাথী অংশগ্রহণকারীদের

ক্ষতিপূরণে সহায়তা দানের দায়-দায়িত্ব পূরণের পরই তাকাফুলে মুনাফা বা উদ্বত্তের বণ্টন কার্যকর করা হয়।

৮. শরীয়া পালন নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী বীমা কোম্পানির একটি শরীয়া উপদেষ্টা পরিষদ বা শরীয়া কাউন্সিল থাকে। এ ধরনের পরিষদ বা কাউন্সিল কোম্পানির কর্মকাণ্ডে শরীয়া পালন সম্পর্কে সদাসর্বদা উপদেশ দিতে থাকে এবং তা পালন নিশ্চিত করে।

৯. সমাজ কল্যাণ কাজে সহায়তা করার জন্য ইসলামী বীমা কোম্পানি একটি যাকাত বা সদাকাহ তহবীল গঠন করে। এ তহবীলে যাকাত, সাদাকা ও সন্দেহযুক্ত আয় (Doubtful income) জমা হয় এবং তা দিয়ে সমাজ কল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ও দারিদ্র বিমোচনে কোম্পানি অংশগ্রহণ করে থাকে।

প্রশ্ন: ইসলামী বীমা ও প্রচলিত বীমার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কী?

উত্তর: উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মকাণ্ড ও কার্যপ্রণালীর দিক থেকে ইসলামী বীমা ও প্রচলিত সনাতনী বীমা ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে পার্থক্যসমূহ আলোচনা করা হলো:

ইসলামী বীমা (তাকাফুল)

১. ইসলামী শরীয়তের অনুশাসনের ভিত্তিতে ইসলামী বীমা পরিচালতি হয়।
২. প্রাথমিক উদ্দেশ্য, পারস্পরিক কল্যাণ ও লাভ-লোকসানের ভাগাভাগি।
৩. শরীয়ার মূলনীতি অনুসারে সকল প্রকার লেনদেন ও বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে সুদ পরিহার করতে হয়।
৪. সবকিছুতে স্বচ্ছতা-পরিচ্ছন্নতা থাকতে হয়। কর্মকাণ্ডে এবং পলিসিতে অস্বচ্ছতা বা ঘারার থাকতে পারে না।
৫. ইসলামী বীমার পলিসিতে জুয়ার কোন উপাদান থাকতে পারে না।
৬. ইসলামী বীমা মুদারাবা নীতিতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।
৭. মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে যাকাত বা সাদাকা তহবীল গঠন করা হয়।
৮. শরীয়া পালন নিশ্চিতকরণের জন্য একটি শরীয়া কাউন্সিল থাকে।

প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা

১. প্রচলিত বাণিজ্যিক বীমা ব্যবস্থায় শরীয়া পালনের কোন প্রতিশ্রুতি নেই।
২. মুনাফা অর্জন প্রাথমিক উদ্দেশ্য।
৩. সুদভিত্তিক লেনদেন করা হয় তাতে কোন প্রকার বাধা নেই।
৪. প্রচলিত বীমা পলিসিতে অস্বচ্ছতা বা ঘারার উপাদান থাকে।
৫. প্রচলিত বীমা পলিসিতে জুয়ার উপাদান থাকতেও পারে বলে মনে করা হয়।

৬. প্রচলিত বীমায় অংশীদারিত্বের কোন বালাই নেই। সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে মালিকগণই লাভ ভোগ করে এর লোকসান গ্রহণ করে।
৭. সে ধরনের কোন তহবীল গঠনের বিধান থাকে না।
৮. এ ধরনের কোন প্রকার কাউন্সিল গঠন করা হয় না।

[সূত্র: ইসলামী বীমা ব্যবস্থা, এম তাজুল ইসলাম]

প্রশ্ন: আয়কর রেয়াত কি? তা কিভাবে দেওয়া হয়। কোম্পানির প্রিমিয়াম তালিকায় লেখা আছে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের ওপর সরকারী নিয়ম অনুযায়ী আয়কর রেয়াত পাওয়া যায়। কোম্পানি এই লেখার অর্থ কী?

উত্তর: সরকারি নিয়ম অনুযায়ী পলিসির বিপরীতে প্রিমিয়াম হিসাবে জমাকৃত টাকার কোন কর পরিশোধ করতে হয় না। সে জন্য বলা হয় যে, জীবন বীমার প্রিমিয়ামের ওপর সরকারী নিয়ম অনুযায়ী আয়কর রেয়াত পাওয়া যায়।

প্রশ্ন: সম্মানিত শেয়ার হোল্ডারগণ এবং পলিসি হোল্ডারগণের জন্য আলাদা আলাদাভাবে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে, যেহেতু পলিসি হোল্ডারগণের জমাকৃত টাকা মুদারাবাভিত্তিক গ্রহণ করা হয়েছে সেহেতু আলাদা আলাদা লভ্যাংশ কতটুকু শরীয়তে বৈধ?

উত্তর: কোম্পানির অর্জিত প্রিমিয়াম বিনিয়োগের পর নিয়মানুযায়ী একচুয়ারী দ্বারা লভ্যাংশ নির্ণয় করার পর সর্বোচ্চ অংশ পলিসি গ্রহীতাগণকে বোনাস (লাভ) এবং কিছু অংশ শেয়ার হোল্ডারগণকে ডিভিডেন্ট দেওয়া হয়, যা শরীয়া-সম্মত পদ্ধতিতেই করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: কোম্পানির পক্ষ থেকে কোন খাতের টাকায় যাকাত দিতে হবে?

উত্তর: যাকাত যে কোন এক পক্ষই দিতে পারেন, পলিসি গ্রহীতা নিজেও দিতে পারেন। কোম্পানিকেও অনুরোধ করা যায় যাকাত আদায় করে দেওয়ার জন্য।

প্রশ্ন: পলিসি গ্রহীতাদের তাদের পলিসির জন্য যাকাত দিতে হবে কি না?

উত্তর: কোম্পানি যাকাত আদায় না করলে পলিসি গ্রহীতাকে আদায় করতে হবে। যদি নিসাব পরিমাণ অর্থ জমা হয়ে থাকে এবং বছর পূর্তি হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: শরীয়া-সম্মত নয় এমন আয়গুলো দ্বারা সাদাকা ফান্ড গঠন করা হয় শুনেছি—এ কোম্পানি এমন কিছু করেছে কিনা?

উত্তর: লাইফ ইন্স্যুরেন্সে সাধারণত সন্দেহজনক আয় আসে না। তারপরও শরীয়া এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রেখে থাকে। এ ব্যাপারে প্রয়োনজীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

[সূত্র: বিশিষ্ট আলিমে দীন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, সদস্য, শরীয়া কাউন্সিল, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড]

প্রশ্ন: বীমা আইন ১৯৩৮ ও বীমা বিধিমালা ১৯৫৮ বলবৎ থাকা অবস্থায় কিভাবে ইসলামী বীমা জায়েয বলে মনে করেন?

উত্তর: ইসলামী ব্যাংক ইসলামী বীমার জন্য কোন পূর্ণাঙ্গ আইন নেই। মালয়েশিয়ার ন্যায় বাংলাদেশেও ইসলামী ইন্স্যুরেন্সের আইন খসড়া আকারে সরকারের নিকট জমা দেওয়া হয়েছে। তাকাফুল অ্যাক্ট পাশ হবে—ইনশাআল্লাহ। পানির অভাবে অযুর পরিবর্তে তায়াম্মুমের বিধান রয়েছে। ইসলামী আইনের অনুপস্থিতিতে কিছু ক্ষেত্রে আমাদেরকে সেভাবে প্রচলিত আইনের আওতায় থেকে কাজ করে যেতে হচ্ছে।

প্রশ্ন: কিছু কিছু ইসলামী বীমা কোম্পানির অফিসের কার্যক্রমে ও পরিবেশে মনে হয় না এখানে কোন শরীয়ার প্রতিফলন আছে, অথচ সেসবও ময়দানে ইসলামী বলে প্রচার করছে এসব বিষয়ে আপনাদের সিদ্ধান্ত কি?

উত্তর: বাংলাদেশে ইসলামী বীমার যাত্রা খুবই অল্প দিনের। যারাই ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার আগ্রহী তাদেরকে নিরুৎসাহিত করা আমাদের উদ্দেশ্যে নয়। তবে একথা সত্য, শরীয়া প্রতিপালন সকলে সমানভাবে করছে না। যারা আন্তরিকভাবে শরীয়া প্রতিপালনে এগিয়ে আসবেন তারাই সফল হবেন বলে আমরা মনে করি। আর যারা শরীয়ার নাম ব্যবহার করে কেবল মাত্র ব্যবসায়িক সুবিধা নিতে চাইবেন তারা অবশ্যই সফল হতে পারবেন না।

প্রশ্ন: গ্রাহকদের প্রদত্ত প্রিমিয়াম কোন কোন খাতে বিনিয়োগ করা হয়?

উত্তর: কোম্পানির যাবতীয় ব্যয়ের মধ্যেই প্রিমিয়ামের টাকা ব্যয় করা যায়। প্রিমিয়ামের অর্থ একদিকে যেমন সঞ্চয় অন্যদিকে বিনিয়োগ। সাধারণত ইসলামী ব্যাংকে টাকা বিনিয়োগে করা হয় এবং ইসলামী ব্যাংকের দেয় মুনাফা বিনিয়োগকারী তথা পলিসি হোল্ডারদের পক্ষে জমা করা হয়। এছাড়া কোম্পানি নিজস্ব উদ্যোগে শরীয়া কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে আরো কিছু খাতে বিনিয়োগ করে অধিক লাভ সংগ্রহের চেষ্টা করে থাকে।

প্রশ্ন: প্রচলিত আইন অনুযায়ী ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংকে সুদমুক্ত ডিপোজিট রাখতে হয় তাহলে এটা কতটুকু সুদ মুক্ত?

উত্তর: প্রচলিত ও সমাজে যতটা সুদমুক্ত হওয়া মানুষের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে তার চেষ্টা করা উচিত। ইসলামী ব্যাংক ও বীমার জন্য আইন তৈরি করার যে প্রক্রিয়া চলছে সেটি সম্পন্ন হলে ইনশাআল্লাহ সকল প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যাবে। তবে এখন বাধ্যতামূলক ডিপোজিটের সুদ পৃথকভাবে সাদাকা ফান্ডে জমা করা হয়। মুদারাবা ও তাবাররুর সঙ্গে তা মিলানো হয় না।

প্রশ্ন: ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের কিছু মাঠ কর্মীর বেতন নির্ধারিত আর কারও বেতন অনির্ধারিত, এটা শরীয়া-ভিত্তিক কিনা?

উত্তর: পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে যেকোন লেন-দেন বৈধ। অবশ্যই চুক্তিটি যদি কুরআন-সুন্নাহের বিরোধী না হয়। অনির্ধারিত বেতনের লেন-দেনের কথার ভিত্তিতে চাকুরী হয়ে থাকলে বেতন অনির্ধারিত হতে দোষ নেই। নির্ধারিত বেতন দিলে তা প্রতারণার মধ্যে পড়বে। বর্তমানে যাদেকের অনির্ধারিত বেতনের চুক্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তাদেরকেই অনির্ধারিত বেতন দেওয়া হচ্ছে। আর কমিশন হিসেবে গৃহীত টাকার লিখিত দায়িত্ব কোম্পানি গ্রহণ করছে বিধায় এটাকে বেতন হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

[সূত্র: প্রিন্সিপাল সাইয়েদ কামালুদ্দীন জাফরী, চেয়ারম্যান, শরীয়া এক্সিকিউটিভ কমিটি, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, ফারইস্ট লাইফবার্তা]

প্রশ্ন: জীবন বীমা কি ইসলামে জায়েয আছে? কি প্রয়োজনে জীবন বীমা করতে হবে?

উত্তর: হ্যাঁ; ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন বীমা জায়েয আছে। কেননা আমাদের প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন,

> 'তোমাদের উত্তরাধিকারীদের (পরবর্তী প্রজন্মকে) নিঃস্ব, পরমুখাপেক্ষী ও অপর লোকের ওপর নির্ভরশীল করে রেখে যাওয়া অপেক্ষা তাদের সচ্ছল, ধনী ও সম্পদশালী করে রেখে যাওয়া তোমাদের পক্ষে অনেক উত্তম।' *[সহীহ আল-বুখারী]*

সম্পদশালী বা ধনী নয়, বরং সাদামাটাভাবে জীবন পরিচালনার উদ্দেশ্যে পরিবারের ভবিষৎ কল্যাণ কামনায়ও ইসলামী শরীয়া মতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে জীবন বীমা করা জায়েয।

ইসলামে জীবন বীমার প্রয়োজনীয়তা

এই পৃথিবীতে ভালো-মন্দ যা কিছু ঘটে তা সবই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে আমাদের জীবনে যেসব দুর্ঘটনা ঘটে, যেসব দুর্যোগ ও বিপত্তির মুখোমুখি আমরা হই তার সবকিছুই ভাগ্যের লিখন বা আল্লাহর ইচ্ছা এবং যদি তাই হয় তাহলে বীমা, জীবন বীমা বা ইসলামী জীবন বীমার প্রয়োজনটা কোথায়?

বিপদ যিনি দেন তিনিই আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। অতএব আলাহ্র ওপর পরিপূর্ণ ভরসা করাটাই বিশ্বাসীদের বা মুমিনদের

উচিত। তাহলে বীমা বা ইসলামী জীবন বীমার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি না সে বিষয়ে অহরহ প্রশ্ন তোলা হয়।

প্রথমত আমাদের বুঝতে হবে যে আল্লাহর ওপর ভরসা করার অর্থ এই নয় যে বিপদ, আপদ ও ঝুঁকি মোকাবেলার ক্ষেত্রে সাবধানতা, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বা কোন কৌশল অবলম্বন করা যাবে না। জিহাদের ময়দানে শীহীদী জীবন সবারই কাম্য। তারপরেও আল্লাহর পথের সৈনিকরা শত্রুর প্রতিটি আঘাতকে প্রতিহত করেছেন এবং যুদ্ধের ময়দানে বর্ম, ঢাল ও তরবারির সাহায্যে নিজের জীবনকে বাঁচানোর জন্য শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত আত্মরক্ষা করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন তার সঙ্গী সাথীদেরকে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে বললেন তখন সবাইকে এক সাথে হিজরত করতে না বলে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন পথে মদীনার দিকে শত্রুর অজ্ঞাতে পাড়ি জমাতে বললেন। নবী মুহাম্মদ (সা.) নিজে যখন মক্কা থেকে মদীনার পথে গেলেন তখনও তিনি সাবধানতা অবলম্বন করে উত্তর দিক দিয়ে মদীনার পথে না গিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত দিক অর্থাৎ দক্ষিণ দিক দিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং সন্ত্রাসী কাফিরদের ভয়ে 'সাওর' গুহায় যখন হযরত আবু বকর (রাযি.)-কে সাথে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন শত্রুরা খুব নিকটে চলে এসেছিল। এ প্রতিকূল অবস্থায় নবী মুহাম্মদ (সা.) ভীত-সন্ত্রস্ত হযরত আবু বকর (রাযি.)-কে বললেন,

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۚ

'চিন্তা কর না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।'[১]

এ ঘটনা থেকে আমরা সহজে বুঝতে পারি যে, আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ ভরসা করা ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাবধানতা ও কৌশল অবলম্বন করা উভয়টি নবীজীর শিক্ষা বা আদর্শ। এ ছাড়া আমরা সেই বিখ্যাত হাদীসটির কথা স্মরণ করতে পারি, যখন তিনি এক বেদুইনকে উপদেশ দিয়ে বললেন,

> 'প্রথমে তোমার উটকে খুঁটিতে শক্ত করে বেঁধে রাখ এবং তারপর আলাহর ওপর ভরসা কর।'

আমরা লক্ষ করি যে, ইসলামী হুকুমত কায়েম হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় গড়ে তোলা হয়েছিল 'বায়তুল মাল' বা গণতহবীল এবং প্রবর্তন করা

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আত-তাওবা*, ৯:৪০

হয়েছিল যাকাত ব্যবস্থা, যাতে করে সমাজের দুঃস্থ, অসহায় এবং সম্বলহীন মানুষদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হয়। সম্পদশালী ও সৌভাগ্যবানদের অর্থ থেকে নিঃস্ব ও বঞ্চিতদের আর্থিক সহায়তা প্রদান ইসলাম ধর্মেল মৌলিক শিক্ষা। একজনের বিপদে অন্যকে সহায়তা করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অবশ্যই করণীয় কাজ। আর এ জন্যই ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইসলামের মৌলিক শিক্ষা 'ভালো কাজে পরস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে' সনাতন জীবন বীমা পদ্ধতির বিকল্প হিসাবে গড়ে তুলেছেন শরীয়ত ভিত্তিক নতুন এক পদ্ধতি, যাকে আমরা 'তাকাফুল' (Takaful) বা 'ইসলামী জীবন বীমা' বলে অভিহিত করতে পারি।

বস্তুত জীবনের কোন বীমা হয় না। কারণ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আর তাই জীবন বীমার বিকল্প হিসাবে গড়ে উঠেছে পারস্পরিক সহযোগিতা ভিত্তিক যৌথ নিশ্চয়তা (Joint Guarantee) তাকাফুল পদ্ধতি। এ পদ্ধতি অনুসারে পারিবারিক ইসলামী জীবন বীমা হচেছ এমন একটি স্কীম বা পদ্ধতি যেখানে এই ব্যবস্থার অধীনে স্বেচ্ছামূলকভাবে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী নিজের এবং অন্য সকল অংশগ্রহণকারীর সুবিধার্থে নিয়মিতভাবে একটি নির্দিষ্ট অংকে চাঁদা বা Premium প্রদান করেন এবং এই মর্মে অঙ্গিকারবদ্ধ হন যে, প্রদেয় চাঁদার একটি অশং অনুদান হিসেবে একটি তহবীলে জমা রাখা হবে। এই জমাকৃত অনুদানকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয়েছে 'তাবাররু'। সুতরাং শরীয়ত ভিত্তিতে পরিচালিত বীমা কোম্পানিতে জীবন বীমা করার প্রয়োজন রয়েছে।

[সূত্র: একেএম মরতুজা আলী, জাতীয় সেমিনার স্বারক ২০০২, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড]